শিল্প সাহিত্য পত্রিকা
কলি
খাতা
প্রথম বর্ষ ।। প্রথম সংখ্যা

শিশু সাহিত্য পত্রিকা
বগলি
খাতা

শিশু সাহিত্য পত্রিকা

কলি

খাতা চৈত্র ১৪২২

প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা

সম্পাদকীয়

গল্প ও প্রবন্ধ

শীর্ষেন্দু দত্ত, শংকর কুণ্ডু, সবচসাচী বসু

কবিতা ও কবিতাগুচ্ছ

বাসব দাশগুপ্ত, সুদীপ দাস, সোমনাথ বয়নাজী, পাপান, মৌসুমী মিত্র (বৈদ্য), বিশ্বরূপ দেবনাথ, বিজয় দাস, কৌশিক চক্রবর্তী, ফড়িং, শৈবাল মাইতি, অমিতাভ সাহা, মৌসম, চয়নজীব সুর

বিশেষ নিবন্ধ

রাহুল দাশগুপ্ত, শুভংকর গুহ

চিত্রকলা

সুদীপ চক্রবর্তী, জয়দীপ নিয়োগী, সৌমেন ভট্টাচার্য, আভিজিৎ শীল, অগ্নিমিত্র দাস, পার্থ সাহা

সম্পাদক

বিজয় দাস

সহ-সম্পাদক

শুভঙ্কর চৌধুরী

প্রচ্ছদ

সুদীপ চক্রবর্তী

অংকরণ

সুদীপ চক্রবর্তী

অগ্নিমিত্র দাস

আশিঞ্জিৎ শীল

যোগাযোগ

৩/৩১/১ , সারদা ব্যানার্জী রোড, চরকতলা, কলকাতা- ৭০০১১১

Email – kolikhata@gmail.com

WhatsApp - ৯১৮৬৯৭০৮০৫০৭

চলভাষ- +৯১ ৮০১৭১০০৯১০

সম্পাদকীয়

"কলিকাতা আছে কলিকাতাতেই" কথাটি যতটা ঠিক, ঠিক ততটাই ঠিক তার আবেগ। সেই আবেগ নিয়েই আজ আমরা "কলিখাতা"। খাতা ও কালি নিয়েই আমাদের হাতেখড়ি। আমাদের এই হাতেখড়ি আমরা উৎসর্গ করছি প্রিয় শহরকে। উৎসর্গ করছি শহরের নতুন প্রজন্মের চিন্তাধারা। মূলত এই উদ্দেশ্য নিয়েই আমাদের আত্মপ্রকাশ।

আমাদের শহর কলিকাতা। আজকের বিশাল, বিস্তৃত, জনবহুল কলকাতা এক সময়ের ছোট্ট একটি নির্জন গ্রাম। আজকের কলকাতার গোড়াপত্তন ঘটে আজ থেকে প্রায় ৩২০ বছর আগে। কলিকাতা, সুতানটি, গোবিন্দপুর এই তিনটি গ্রাম নিয়ে কলকাতা শহরের প্রথম আত্মপ্রকাশ। গ্রাম থেকে শহরে পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তন এসেছে তার নামেও, কলিকাতা হয়েছে ক্যালকাটা তারপর আজ হয়েছে কলকাতা।

আজ আমাদের শহর অনেকটাই বিস্তৃত। গড়িয়া থেকে দমদম, রাজারহাট-নিউ টাউন-সল্টলেক থেকে বি-বা-দি বাগ। লক্ষ লক্ষ মানুষ, হাজার হাজার গাড়ি আজ ছুটে বেড়াচ্ছে শহরের বুকে। কলকাতা বলতেই আজ আমরা জানি রাস্তার মোড়ে ফুচকা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, নন্দন, বইমেলা, দুর্গাপুজো, কালীঘাট এই পাড়া, আকাশ ছোঁয়া সব বাড়ি এমন আরও অনেককিছু। কিন্তু আমরা জানিনা আমাদের শহরে বস্তির সংখ্যা কত। জানিনা সেখানের মানুষ আজও মানুষ আছে কীভাবে। জানিনা কীভাবে দিনের পর দিন, প্রজন্মের পর প্রজন্ম রাস্তায়, ফুটপাতে, ব্রিজের নীচে, প্ল্যাটফর্মের উপর, এমনকি খালের ধারে শুয়ে রাত কাটানো যেতে পারে। জানিনা এই হাজার হাজার মানুষ কীভাবে আপন করে নিয়েছে এই শহরকে। কীভাবে এরাও নিজেদের জড়িয়ে নিয়েছে শহরের গতিতে।

আমার শহর City of Joy অর্থাৎ আনন্দের শহর। এখানে আনন্দ করার জন্য আমাদের কোন নির্দিষ্ট সময়, অনুষ্ঠান বা উৎসবের প্রয়োজন হয় না। দরকার শুধু হুজুগের। কলকাতা শহর হলেও খুবই আত্মকেন্দ্রিক। যে সবসময় নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত, কখনও ফুটবলের হইহট্টগোল, কখনও বা ক্রিকেট; কখনও দুর্গাপুজোর উন্মাদনা, কখনও বা ঈদ-মহরম আবার কখনও ক্রিসমাসের মজা। একটি শহর বারবার দেখা দেয় বিভিন্ন সাজে।

কলকাতা মানেই বাঙালিয়ানা। কলকাতা মানেই ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান, কোলকাতা মানেই রবীন্দ্রনাথ-[illegible] জোড়াসাঁকো, কলকাতা মানেই ট্রামে চড়া। কলকাতা মানেই বালীগঞ্জ লেক-এ একটু প্রেম, কলকাতা মানেই যানজট। কলকাতা মানেই মিছিল-মিটিং, কলকাতা মানে চায়ের কাপে রাজনীতি। আজ কলকাতা মানেই আমি, আজ কলকাতা মানে তুমি, কলকাতা মানেই আমরা। আর আমাদের চিন্তাধারা হল আগামী দিনের শহর। আগামীর ভবিষ্যৎ। আমাদের শহর-কলিকাতা।

বাংলা সাহিত্য পত্রিকায় নতুন আরেকটি নাম যুক্ত হল "কলিখাতা"। আজকের যুব ও যুবক সমাজ অধির আগ্রহে অপেক্ষা করছে তাদের সাহিত্য ও শিল্প কুশলতা প্রত্যেকটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে। আর তাদের একটিই আশ্রয় হল "কলিখাতা"। সাধারণ এবং অসাধারণ প্রত্যেকটি মানুষের কাছে পৌঁছানোর মাধ্যম হল এই পত্রিকা। পুরানোর সাথে নতুনের মেলবন্ধনের পথ প্রদর্শক হিসাবে প্রত্যেকের যোগদান একান্ত কাম্য। আমাদের এই উদ্যোগের বাস্তবায়িত রূপ "কলিখাতা"।

আমার নগর যাপন

শীর্ষেন্দু দত্ত

খুব কম বয়সে বাবাকে খুইয়ে মায়ের হাত ধরে আমার মহানগরে প্রবেশ। মহানগরের নাম কলকাতা। সালটা ১৯৭৬। যে পাড়াটায় আমরা উঠি সেটার নাম সিমলা পাড়া। আমার জন্ম ও বেড়ে ওঠা জামশেদপুরে। দূরের দলমা পাহাড় পরিষ্কার দেখা যেত যেখানে থাকতাম সেখান থেকে। দলমার সামনে বেড়ে ওঠা আমি, উত্তর কলকাতার এই সিমলে পাড়ায় এসে সব কিছুতেই ঘেঁটে গেলাম

ট্রাম রাস্তার সামনে বাড়ি। কোথাও ঘাস মাটির দেখা নেই। বৃক্ষ তো দূর অস্ত। সারাদিন শুধু মানুষ আর গাড়ি। সন্ধ্যা হলেই কোথা থামতিতে মদের আসর। আড্ডাবাজি রাতে, বোমাবাজি, পুলিশ, অ্যাকশন। দোতলার বারান্দাতে বসে অবাক হয়ে দেখতাম সেসব। ঢং ঢং শব্দ করে রাস্তা দিয়ে ট্রাম চলছে। বিকেলবেলা অফিস ছুটির সময় রাস্তাঘাট জ্যাম, হর্নের চিৎকার, বাসে ট্রামে বাদুড় ঝোলা মানুষ। এসব দেখতে দেখতে মনে পড়ে যেত জামশেদপুরের চড়াই উতরাই দিয়ে দৌড়ে স্কুলে যাতায়াতের কথা। জামশেদপুরে আমার চলাচলে কোনো লাগাম ছিলনা। কেউ কোথাও কখনো যেতে নিষেধ করত না। আর এখানে দোতলা থেকেই নামা নিষেধ। তিন বাই ছয় ফুটের বারান্দাটা যেন একটা পাখির খাঁচা।

আমাদের সামনের বাড়িটাই ছিল শ্রীমানি বাজার। সারাদিন সেখানে ছিল বচসা, কোলাহল। ভোর থেকে শুরু হত। রোজ আলো ফোটার আগে যখন ট্রাম যাবার শব্দে ঘুম ভেঙে যেত, তখন দেখতাম পরপর লরি এসে থামছে বাজারের গেটে। কয়লার লরি, বরফের লরি, সব্জির লরি। তারপর জমাদার এসে গঙ্গা জলের লাইনে হোসপাইপ রাস্তা ফুটপাথ সব ধুতো, সেটাও একটা দেখার মতো জিনিস বটে। অতোবড় পাইপ আর অমন সাংঘাতিক জল স্পিড আমার চোখের পলক থামিয়ে দিত। এসব কিছুতো আগে দেখিনি। এতোদিন দেখেছি পাহাড়ি রাস্তার আম জামুন, জঙ্গল, সুবর্ণরেখা, দলমা পাহাড়ের সেই কপি মন্দির, হাতি নিয়ে মাহুত দের বাড়ি বাড়ি ঘোরা। আর মুরগি লড়াই, আদিবাসি যুবকের তিরন্দাজি। আর কলকাতায় এসে দোতলা বাস, ট্রাম, জলময় ঠনঠনিয়া মন্দির আর ছাদে উঠলেই হাওড়া ব্রিজ। এছাড়া আরো কত নতুন নতুন জিনিস। যার অনেককিছু বইতে বা সিনেমাতেও দেখিনি। যেমন লোডশেডিং।

সেসময় টেলিভিশন সদ্য সদ্য এলেও তাতে চ্যানেল ছিল দু একটা। আজকের মতো চ্যানেল সার্ফিং এর সুযোগ ছিলনা। কিন্তু আমার বাসার বারান্দাটি আজকের মাল্টি চ্যানেল টিভির মতোই ছিল। একেক দিকে চোখ ঘোরাও একেক রকম সিনারিও —স্টোরি-ক্লাইম্যাক্স। এটাই কলকাতা। টিপিক্যাল উত্তর কলকাতা।

ট্রাম রাস্তার উল্টোদিকে পার্শিল স্কুল। তাকে কেন্দ্র করে ফুচকাওলা, সরবতওলা, হজমীওলা, এদিক ওদিক কিছু উঁকি ঝোকে। বাজারের গেটে আরেক সিনারিও। মুটেদের আড্ডা নিয়ে ঝগড়া চলছে। ইটালিয়ান সেলুনে লাইন। নাপিতের মুখে রফির গান। আমাদের বারান্দার ঠিক নিচে চায়ের দোকান আর ছাপাখানা। সেখানে আড্ডা চলে সারাদিন। নানারকম লোকজন চায়ের কাপে চুমুক মারছে। সকালের আড্ডায় পাড়ার মেয়ে বউদের নিয়ে গসিপ ছেলে বুড়োর দলেদের। দুপুরে কারবারি, মুটে আর পথচলতি অজানা মানুষ। বিকেলের আড্ডায় ফুটবল, ক্রিকেট, রাজনীতি। সন্ধ্যে হলেই পাড়ার মাস্তান, টিউটরদের নিষিদ্ধ কথাবার্তা। বাঁ দিকে কুন্ডুদের রোয়াকে মাড়োয়ারি বাড়ির ঝিদের পরনিন্দা পরচর্চা। হাত দশেক দূরে ফুটপাথ দখল করা জ্বালানীকাঠের কারবারি। ফুটপাথেই তার দুই বৌয়ের সংসার। তাদের সারাদিনের তরজা।

পাড়াটায় অনেক বিহারীর বাস ছিল। এরা বেশিরভাগই রিক্সা বা ঠেলা চালাতো। পাড়ার মোড়ে এইসব রিক্সা আর ঠেলার স্ট্যান্ড ছিল। যখন তারা না থাকত তখন রিক্সা আর ঠেলার উপর বসে আড্ডা চলত। বাঁশ দিয়ে তৈরি এজাতীয় ঠেলাগাড়ি এখন কলকাতায় প্রায় নেই। বড়োবাজার বা মানিকতলার দিকে কিছু দেখা যায়।

দিনের শেষে ঠেলার ওপর রাতের রুটি সবজি বানানো হত পাল্লা করে। এই রান্নাপর্ব আমি মন দিয়ে দেখতুম। বিজ্ঞাপনের কেউ কেউ বানাতো পিঠে। ধনেপাতার চাটনী সহযোগে যা খেতে দারুণ টেস্টি, বড় হয়ে খেয়েছিলাম।

বারান্দা থেকে সিমলা স্ট্রীটের শেষ যে দিকটা নজরে আসতো সেটা হল সনাতার দোকান। সনাতার বারান্দার পাশে একটি চায়ের দোকান ছিল। আবার খুব ভালো কাঠের কাজ জানতো। ওর দোকানটি কাঠ আর টিন দিয়ে নিখুঁত ভাবে বানানো ছিল। নিচ থেকে বেড়ে ওঠা লতাপাতায় দোকানের পুরো মাথা ছেয়ে ঢাকা ছিল। ওখানেই সে থাকত। যদিও ওর স্ত্রী,সন্তান অন্য কোথাও থাকত। সনাতাকে দেখতাম সবাই খুব সম্মান করে। পরে জেনেছিলাম নকশাল আমলে ও অনেক ছেলেকে পুলিশ ও বিরোধী দলের হাত থেকে রক্ষা করেছিল। রথের এক দুমাস আগে থেকে ও কাঠের রথ তৈরি শুরু করত। বছরের দুটো কি তিনটে রথ বানাতো,যা বানানো শেষ হবার সাথে সাথে এলাকার ধনী লোকেরা কিনে নিত। অমন সুন্দর রথ যা আজ অবধি আমি কোথাও দেখিনি। সেই কটা দিন রোজ আমি তা বানানো দেখতাম বারান্দা থেকে।

সনাতার দোকানের পাশেই ছিল জানুদার সাইকেল সারাই এর দোকান। সাইকেল সারানো দেখতে আমার বিশেষ উৎসাহ না থাকলেও বিভিন্ন সময় সেখানে সুন্দর সুন্দর যে সাইকেল গুলো আসতো আর যে ফুটবলগুলো হাওয়া ভরাতে আনা হত সেগুলো দেখতে আমার খুব ভালো লাগত। মানে সেই সুন্দর সাইকেলগুলো দেখলে আমি চালাতে পারতামনা,আর সেই চুপসে যাওয়া চামড়ার বলগুলো যেগুলো পাম্পের সাথে সাথে ফুলে উঠত। তখন ফুটবল যে আমার প্রিয় খেলা। পরে মা আমাকে খুব সুন্দর একটা বল কিনে দেয়। আমি সেটা হাওয়া ভরাতে নিয়ে গেলে জানুদা পয়সা নিত না।

সারাদিন ধরে এমন আরো কতকিছু দেখতাম বারান্দাতে বসে। ট্রাম রাস্তার ওপারের ফুটপাথে একটা লোক পুরনো স্ট্যাম্প বেচতো স্কুলের ছেলে মেয়েদের কাছে। তিনটে স্ট্যাম্পের অ্যালবাম নিয়ে সে বসত। বাবার থেকে স্ট্যাম্প জমানোর নেশাটা পেয়েছিলাম। আমার খুব ইচ্ছা হত ঐ তিনটে অ্যালবাম লোকটার থেকে কিনে নি। ভাবতাম বড়ো হয়ে রোজগার করে ওর স্ট্যাম্প কিনে নেব। তারপর সত্যিই একদিন বড়ো হলাম। পকেটে কিছু পয়সা হল। কিন্তু তখন সেই লোকটা আর স্ট্যাম্প বেচতো না, শিকার বেচতো। জানতে চেয়েছিলাম স্ট্যাম্প আর বেচেন না কেন? ও বলেছিল, সব স্ট্যাম্প শেষ হয়ে গেছিল।

আমাদের ফ্ল্যাটের উল্টোদিকে শ্রীমানী মার্কেটের দোতলায় নানারকম অফিস ছিল। তিনতলার ছাদে ছিল অ্যাসবেস্টার্স দেওয়া ছোটো ছোটো কারখানা। কিছু পরিবারও থাকতো। দোতলার প্রধান অফিস ছিল 'সাধনা ঔষধালয় ঢাকা' এর হেড অফিস। তাদের দুটি ঘর আমাদের ঘরের ভিতর থেকে দেখা যেত স্পষ্ট। একটা হল মালিকের চেম্বার। আরেকটায় একজন ক্লার্ক বসে কাজ করত। তখন এদের বিশাল ব্যাপার। বিদেশেও এক্সপোর্ট করত। মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট, সারিবাদি সালসা- আরো কিছু বোতলের দারুন সেল তখন। অফিসের গায়ে বিরাট বিরাট টিনের বোর্ডে তার অ্যাড ঝুলত। পরে ক্লাস টেন পড়ার সময় এক বন্ধুকে রাম বলে সেই মহাদ্রাক্ষারিষ্ট খাইয়েছিলাম। তার নাকি নেশাও হয়েছিল। সে এখন পুলিশ অফিসার।

রোজ সকালে বাজারের লালুদার আলুর দোকানে গিয়ে খবরের কাগজ পড়াটা আমার আরেকটা নেশা ছিল। কারণ বাড়িতে কাগজ আসত না। লালুদা আমার সাথে যথেষ্টই ভাল ব্যবহার করত। কোনোদিন না গেলে পরদিন কেন আসিনি জিগ্যেস করত।

তখন তো টিভি ও নেই। বিশ্বকাপে মারাদোনার পরের পর ম্যাচ। বা দেশের কাপের উত্তেজনা, ফুটবলারদের মতো দেশগুলোর ম্যাচ দেখতাম পাড়ার টিভির দোকানে। প্রথম প্রথম ফুটপাথে দাঁড়িয়ে উঁকিঝুঁকি মারতুম। একদিন দোকানদার ভিতরে এসে দেখতে ডাকলো। অনেকের সাথে আমিও সেখানে বিনি পয়সায় খেলা দেখার বাঁধা খরিদ্দার হয়ে গেলাম। এই জানুদা, লালুদা বা টিভির দোকানদারের মতো অনেকেই আমাকে এই মহানগরের নিঃসঙ্গতা অনুভব করতে দেয়নি। বাবা না থাকার আর্থিক যন্ত্রণা এমন অনেক মানুষরাই ভুলিয়ে দিয়েছিল এই নতুন শহরে।

আজকের শহরটা কি কেমন আছে? জানিনা। বা জানার প্রয়োজনটাই নেই। কারণ আজ ঘরে ঘরে টিভি, কম্পিউটার, ইন্টারনেট।

প্রথম দিকে খুব কষ্ট হত এই ইট-কাঠ-পাথরের শহরে। জামশেদপুরের লাল মাটি, কাঁঠাল গাছ, গিরগিটি এসব মিস করতাম। কিন্তু কিছুদিন পরই মহানগরীর আস্বাদ নিতে শিখে গেলাম। ফুটবলের নেশাতো ছিলই। আমাদের ফ্ল্যাটের উপরতলায় থাকত

রুবিমামা, মোহনবাগানের মেম্বার। তার হাত ধরে যাওয়া শুরু হল ময়দানে। মোহনবাগানের সবুজ গালিচা পাতা মাঠ কিংবা ইডেন গার্ডেনের ভর্তি গ্যালারী- আমার মনে হতে লাগলো আমি যেন স্বর্গে পৌঁছে গেছি! এতো সুন্দর,রোমাঞ্চকর জায়গা তো আগে দেখিনি। আমার বারান্দায় বসে যে ট্রামকে সরীসৃপ মনে হত, তাকে দারুণ সুন্দরী মনে হতে লাগল, যখন ময়দানের ভিতর দিয়ে খিদিরপুর গামী ট্রাম যেতে দেখলাম। পাড়ায় লাহাদের মাঠে কালীপুজোর ফাংশানে হেমন্ত, মান্না, আরতি। রাত গভীর হতেই অমিতবন্ধু ঘোষ, গৌতম ঘোষ, ড্রামের ঝিমি ঝিমি...

রেসকোর্সের মাঠে ঘোড়া ছুটছে, বাগবাজার ঘাটে লঞ্চ। নিজেকে প্যারিসে আবিষ্কার করতে লাগলাম নিয়মিত। কিন্তু মাঝে মাঝে স্বপ্ন ভঙ্গের মতো ইন্দিরা গান্ধীর হত্যার দিনটা। পার্সি স্কুলের স্কুল বাসগুলোর পাঞ্জাবি ড্রাইভারদের পরিবারগুলোর আতঙ্কগ্রস্ততা থমকে দিয়েছিল মহানগরের স্বাভাবিক গতিকে।

মিস শেফালী তখন 'রাতের কলকাতার রাণী'। আমাদের পাড়ায় আসতো ওর বোনের কাছে। আমার মামা চাকরি পেয়েছিল গ্রান্ড হোটেলে।মায়ের কাছে গল্প করত সেখানকার।সে গোগ্রাসে মুখ করে শুনতাম সেসব মুখরোচক চাটনী। সবটা নিয়ে কলকাতা বড়ো রহস্যময়ী।কতো রহস্য লুকিয়ে আছে এই শহরের গলিঘুঁজিতে। তার কতোটুকুই বা আমি জানতে পেরেছি তখন।

আমার সাড়ে চার বছর বয়সে আমার বাবা মারা গেছিল জামসেদপুরে। আমি শ্মশানে যাইনি। প্রথম শ্মশান দেখি কলকাতায়। নিমতলা ঘাট। ভয়, ধোঁয়া এসব ছিল। পাড়ার বুড়িমাকে পোড়াতে গেছিলাম। মৃতদেহের লম্বা লাইন। অপেক্ষা করতে করতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙল ছাগলের গলার ঘন্টির টিং টাং-এ। দেখলাম একটা মড়ার খালি খাটিয়ায় শুয়ে! কলকাতা শিখিয়ে দিল শ্মশানকে চিনে নিতে। কানে বাজছে সুমন চাটুয্যের গান- "এ শহর জানে আমার প্রথম সব কিছু..."

হঠাৎ একদিন দেখলাম শহর জুড়ে বড়ো বড়ো গর্ত খুঁড়ে ফেলেছে কারা যেন। পাতাল রেল হবে নাকি। শহর বদলের আভাস পেলাম। টানা রিক্সা নিষিদ্ধ হল। পুলিশ শুরু করল রিক্সা ধরা অভিযান। পাড়ার মোড় থেকে পুলিশ রিক্সাগুলোকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ভ্যানে টানতে টানতে নিয়ে যেতে শুরু করল মাঝে মাঝেই। ওলোটপালোট খেতে খেতে গাড়িগুলোকে নিয়ে যাওয়া হত। আর অসহায় রিক্সাওয়ালারা পিছন পিছন ছুটত। ছোটো থেকে চেনা সেই রিক্সাওয়ালাগুলোকে দেখে খুব কষ্ট হত। ঠিক একরকমই কষ্ট পেতাম যখন পাড়ার প্রিয় কুকুরগুলোকে কর্পোরেশনের গাড়ি এসে নৃশংস ভাবে সাঁড়াশি দিয়ে তুলে নিয়ে যেত। ঠেলাও উঠে গেল। তার জায়গায় চালু হল সাইকেল ভ্যান। লাহাদের মাঠে প্রমোটিং হয়ে গেল। হেমন্ত, মান্নাও বয়েস হয়ে গেল।

সিমলা স্ট্রিটে ছিল স্বামীজীর বাড়ি। সেখানে ওনার বংশধরেরা থাকত। তাদের একজন আমাদের স্কুলে পড়ত। তার সাথে স্বামীজীর কিছুটা সাদৃশ্য ছিল।পুরনো কড়ি বরগার বাড়ি। এখন আর সেসব নেই। মিশন সব অধিগ্রহণ করে বিরাট বাড়ি বানিয়ে ফেলেছে। সাথে সাথেই শেষ হয়ে গেছে পুরনো কলকাতার অনেক নষ্টালজিয়াকে। বিখ্যাত চাচা রেস্তোরাঁ তখন ওখানে ছিল। নতুন নির্মাণ হবার সময় তারা বিধান সরণীর উল্টো ফুটে দোকান নিয়ে উঠে যায়। তখন শুনতাম চাচার কাবাব কলকাতার সেরা। গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রিট, যা সিমলা স্ট্রিট আর বিধান সরণীর সংযোগকারী রাস্তা, তাতেই স্বামীজীর এই বসত ভিটা ছিল। সেখানে এক বিখ্যাত পুরনো রাইস হোটেল ছিল। সম্ভবত শ্রীদুর্গা হোটেল নাম ছিল। তাদের মাছের কালিয়া আজো মুখে লেগে আছে। কলাপাতায় ভাত, ডাল, আলুভাজা, লেবু, লংকা। লাটে পেঁয়াজ রসুন কসে মাছের কালিয়া। মাটির গ্লাস, কলাপাতার থালা, মাথার উপর পেল্লাই ডিসি ফ্যানের ঘটঘটাং শব্দের হাওয়া।

এই গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রিটের মুখেই প্রথম বার সিগারেট খাই স্কুলে পড়ার সময়। এক তরুণ বয়েসী লোকের থেকে আগুন চেয়েছিলাম সিগারেট ধরাতে। ধরাতে পারছিলাম না। লোকটিই বলে দিল, সিগারেটটা টানতে হয়, নাহলে ধরেনা। সত্যি সুমনা "এ শহর জানে আমার প্রথম সবকিছু..."

সিমলা স্ট্রিটে মান্না দের বাড়িটাও আমাদের কম বয়েসে একটা আকর্ষণের জায়গা ছিল। বাড়ির সামনে পাথর বাঁধানো রোয়াক। আমাদের বাড়ি থেকে ঠনঠনে কালিবাড়ির দিকে যেতে মুক্তারামবাবু স্ট্রিটে শুনেছি সাহিত্যিক শিব্রাম চক্রবর্তি থাকতেন।

আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে একটা গলি চলে গেছে, যার নাম সরকার বাই লেন। সেটা আমার কাছে এক আজব চিড়িয়াখানা লাগত। ওখানেই আসত মিস শেফালী, ওর বোনের কাছে। সাথে থাকত ওর দু'তিন জন ছাত্রী বা চেলী ভাদার। আরেকটি বাড়িতে মাঝে

মাঝেই এক মহিলা আসতো দু'তিন দিনের জন্য। সে এলেই সেই বাড়িটা বদলে যেত। ঘরের সব কটা আলো জ্বলতো অনেক রাত অবধি। উচ্চ স্বরে কথা ও হাসির শব্দ তরঙ্গায়িত হত গোটা সরকার বাই লেন জুড়ে। যা অন্য সময় দেখা যেত না। পুরনো জরাজীর্ণ সেই বাড়ির বাসিন্দারা ছিল খুবই গরীব, অন্তত আমার সেরকমই মনে হত। সেই মহিলা এলে রোজ তিনি দু হাত ভরতি বাজার করতেন। বাড়ির লোকজনদের নিয়ে কাছের বীনা সিনেমা হলে সিনেমা দেখতে যেতেন। মহিলার মহিলার পোশাক, আচরণ সবই খুব উগ্র মনে হত আমার। জেনেছিলাম মহিলা সোনাগাছির বেশ্যা। মাঝে মাঝে বাসায় আসে। ওর টাকাতেই এই বাড়ি চলে। এই প্রথমবার আমার বেশ্যা দর্শন।

তারপর আরো কতো বেশ্যা দেখলুমা জানতে পারলাম ও দেখলাম উত্তর মধ্য কলকাতায় একাধিক বেশ্যালয় আছে। যা কলকাতার অঙ্গ। সন্ধ্যেবেলার বেশ্যালয় দেখেছেন? সে এক দেখার জিনিস বটে! রিক্সা করে, গাড়ি চেপে, পায়ে হেঁটে বাবুরা চলেছেন বেশ্যাগমনে। সোনাগাছি হল এশিয়ার বৃহত্তম বেশ্যালয়। সোনার গাজি নামক এক গাজির নামে জায়গাটার নাম। এখানে যারা কম পয়সার বেশ্যা, নিজেদের ঠিকঠাক ঘর নেই তাদের বলা হয় বক্সের মেয়ে। আর বেশি রেটের যারা এবং ফ্ল্যাটে থাকে তাদের ফ্ল্যাট বাড়ির মেয়ে বলে। যেমন নীলকমল হচ্ছে এখানকার সবথেকে নামকরা ফ্ল্যাট। সোনাগাছিতে মন্দির ও পীরের দরগা পাশাপাশি অবস্থান করে। এক শীতের সকালে দেখেছিলাম লরি ভর্তি নেপালী মেয়ে ঢুকছে সোনাগাছিতে।

হেদুয়া পার্কের উল্টোদিকে রামদুলাল সরকার স্ট্রিট দিয়ে একটু গেলেই বাঁ দিকে চক্রবেড় লেন। এটিও একসময় বেশ্যাপল্লি ছিল। পরবর্তীতে তা উঠে যায়। সেই বাড়িগুলোতে গিয়ে দেখেছি লাইন করে সারি সারি ঘর তালা বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। এলাকার মানুষের প্রতিরোধে বন্ধ গণিকালয়। যেন এক মৃত নগরী। বিশ্বযুদ্ধের সময় বোমা পড়ার ভয়ে অনেক জায়গায় নাকি এমন দিন দেখা যেত। এই পাড়ার আদি বাসিন্দারা বাইরে গিয়ে বলত না যে তারা চক্রবেড়ে থাকে। পট্টি বন্ধ হবার বহু বছর পরও এই মানসিকতা বজায় থেকেছে।

বারান্দায় বসে বসে দেখতাম সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তের মধ্যে কেমন বদলে যেতে থাকে শহরটা। সন্ধ্যে শেষ হয়ে যত রাত এগিয়ে আসে তত চরিত্র বদলাতে থাকে সবকিছুর। কমতে থাকে শব্দের ডেসিবেল, কলকানি। আটটা বাজতেই সব দোকানপাট বন্ধ হতে শুরু করে। কোলাহল কম করে কমে আসে। বাসস্ট্যান্ডে ভিড় বাড়তে থাকে শহর ছেড়ে চলে যাওয়া মানুষজনেদের। কম করে রাত্রি কাঁপিয়ে পরে ঘাড় কামড়ে ধরে মহানগরের। অন্ধকার, নিস্তব্ধতা বেড়ে চলে। অদ্ভুত শান্ত হয়ে পড়ে মাতাল, অশান্ত এই শহরটা। বোঝা যায় সারাদিন ধরে যাদের দেখি তাদের বেশির ভাগ এই শহরের বাসিন্দা নয়। ট্রেনে বাসে করে তারা রোজ সকালে এখানে আসে। আর কাজ সেরে রাতে ফিরে যায় দূরে। বেলঘরিয়া, সোদপুর, বনগাঁ, বারাসাত কিংবা ক্যানিং, শামবাজার, সোনারপুর বা হাওড়া জেলার কোথাও। এরা কোনোদিন সকালে না এলে কি হবে এই শহরটার? অনেকেই আছেন যারা আগে এই পাড়াতেই থাকত, কিন্তু স্থানাভাবে দূরে কোথাও চলে গেছে, ঘরও বেঁধেছে, বিয়ে করেছে। কিন্তু জীবিকার টানে এখানে ফিরতে হয় রোজ। এদের এই লড়াই আমায় অবাক করত। কে জানত একদিন আমিও এদের মতোই জীবন যাপিত করব। জীবনটা বড়ো অদ্ভুত। যাদের দেখে একসময় অবাক হতাম, আজ তাদেরই একজন!

স্কুল জীবনে লুকিয়ে সেই সিগারেট টানার গলিটার নাম এখন মনে পড়ছে না। যেটা হেদুয়া বিডন স্ট্রিট থেকে শুরু হয়ে আমাদের স্কুল স্কটিশ চার্চে গিয়ে শেষ হতো। পুরনো পুরনো সব বাড়ি। পাশাপাশি দুজন হাঁটা যায়না। এমন গলি পরবর্তী সময়ে কাশীতে পেয়েছিলাম। হেদুয়ার সেনাপতির দোকান থেকে সিগারেট কিনে পুরো গলিটা পেরোতে দশ মিনিটের বেশি সময় লাগত।

মানিকতলায় স্কুলের বিশাল মাঠ। মাঠের মালি পিটারদার মুখটা আজো মনে পড়ে। গোলগাল কালো কুচকুচে চেহারা, ধবধবে দুধ সাদা ছোটো করে ছাঁটা চুল। বড়ো বড়ো উজ্জ্বল চোখদুটো দেখলেই প্রেমে পড়ে যেতে হয়। মুখে সবসময় হাসি। ছেলেরা মাঠে এলে খুব খুশী হত। ঘর থেকে সরঞ্জাম বের করে এনে দিত। নানান গল্পো জুড়ে দিত।

স্কুলের উল্টোদিকে ভীম ঘোষ লেনে লাল্টুর বাড়ি। আমার ছেলেবেলার বন্ধু কান শুরু, যে আমার নামকরণ করে শিভ। যার হাত ধরে প্রথম বেশ্যালয় দর্শন। সেইসব দিনগুলো থেকেই মহানগরীর পুরো স্বাদ পেতে শুরু করে দিই। মাল খেয়ে মাঝরাতে কালীমূর্তির স্তনে হাত রাখা, গরুর মাংস ঠনঠনে কালীবাড়িতে রেখে আসা, ছাতুবাবু বাজারে মদের ঠেক ভাঙা, প্রথম প্রেম, আরো কতো কিছু।

মাঝরাতে শুনশান ট্রাম রাস্তা দিয়ে হেঁটেছেন কখনো? যদি না হেঁটে থাকেন তাহলে এই শহরের আসল মজাটাই আপনি মিস করেছেন। আমার সুযোগ হয়েছে একবার। চারিদিক ঘোর কালো অন্ধকার, স্ট্রিট লাইট ছাড়া কোথাও কোথাও কোনো আলো নেই। প্রতিটা বাড়ির তলে একটা করেই জমাট নিশি। পূর্ণিমার চাঁদের আলো পড়ে ট্রাম লাইনের ইস্পাত গুলি চকচক করছে। যতদূর চোখ যায় খাঁ খাঁ ফাঁকা। পুরনো অন্ধকার বাড়িগুলো দেখে ভূতুড়ে হানাবাড়ি মনে হয়। ট্রাম লাইনের মাঝখান দিয়ে আমি হেঁটে চলেছি। গোটা শহরটাকে মৃত মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে বাড়িগুলোর ভিতর কেউ নেই। কোথাও কোনো শব্দ নেই। শব্দহীনতাও যেন একটা মূর্ছনা তৈরি করে। হঠাৎ হঠাৎ সেই মূর্ছনা ছাপিয়ে সশব্দে উড়ে যায় কোনো রাতজাগা পাখি। ফুটপাথে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকা নেড়ি কুকুর কালু উঠে এল আমার সাথে। কিছুক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে থেকে ও- ও সঙ্গী হল আমার। হেঁটে চলল পাশে পাশে। সেদিন আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন যুধিষ্ঠির হিমালয়ের পথ দিয়ে শেষযাত্রায় চলেছি স্বর্গদ্বারে। এই ট্রামরাস্তাটা যেন হিমালয়ের পাকদন্ডি। আমি আর আমার সাথী কালু। যুধিষ্ঠিরের শেষযাত্রার সাথী। এই শহর আসলে এক মহাভারত। ট্রাম, মিস শেফালি, সনাথ, লালা, মুক্তমঞ্জরী সব সরেছে রাতের কলকাতা থেকে। এখন এই কালখণ্ডে শুধু আমি আর কালু... আমি যুধিষ্ঠিরের শেষযাত্রা।

প্রাণপুষ্প

শংকর কুণ্ডু

হোল্ড ইয়োর আর্মস। অন দ্য ট্রিগার। ফায়ার। টার্গেট ময়দান। বাংলায় বললে, চাঁদমারি ময়দান। এই ময়দানে রবিবার সকালে বন্দুক চালনা প্র্যাকটিস করতে এসেছে প্রেসিডেন্সি কলেজের কয়েকজন ছাত্র। তাদের একজনের নাম সুভাষ চন্দ্র বসু। ছাত্র-ছাত্রীদের সমরশিক্ষা জরুরি মনে করে সে। তখন প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছে। ১৯১৪ সাল, যুদ্ধ চলে চার বছর, ১৯১৮ পর্যন্ত। যুদ্ধ হচ্ছে অক্ষশক্তি বনাম মিত্রশক্তি। অক্ষশক্তিতে আছে জার্মানি, ইতালি আর জাপান। মিত্রশক্তিতে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, আমেরিকা। ইংরেজদের উপনিবেশ ভারত। ভারত থেকে সৈন্যের যোগানের প্রয়োজন অনুভব করেছে ইংরেজরাজ। পাঞ্জাব রেজিমেন্ট, গোর্খা রেজিমেন্টের মতো অন্যান্য প্রদেশ থেকেও প্রশিক্ষিত সৈন্যের দরকার হয়ে পড়েছে। ছাত্ররা আগামী দিনের যুবশক্তি, তাদেরও প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরি করা প্রয়োজন। প্রেসিডেন্সি কলেজের ভালো ছাত্রদের তাই ক্যাডেট কোরের অংশীদার করে নেওয়া হয়েছে।

সুভাষের প্রথম গুলি – চাঁদমারিতে লাগল না। কারুরই লাগল না। ইংরেজ কমান্ডার হুকুম করল, নিশানা ঠিক করতে। তারপর ট্রিগার দাবাতে। দ্বিতীয়বারও তৃতীয়বারও পুরনো বন্দুক, বহুবার ব্যবহৃত। নতুন বন্দুক সমরাঙ্গনে পাঠানো হয়েছে। ছাত্রদের হাতে নতুন বন্দুক দেওয়ার দরকার কী? কয়েকবার অভ্যাসের পর চাঁদমারিতে গুলি লাগল। পরিশ্রম সার্থক সুভাষের, এবং সঙ্গী-সাথীদের।

প্রায় একশো একরের মতো জমিতে ব্রিটিশ সামরিকবাহিনীর এই চাঁদমারি ময়দান। পঞ্চাশ ফুট মতন উঁচু ঢিপি, তার ওপর কংক্রিটের টার্গেট। লম্বায় ২০০ ফুট, চওড়ায় ৩ ফুট, উচ্চতায় ২০ ফুট – এরকম তিনটি টার্গেটে ইংরেজিতে এক থেকে নয় সংখ্যা বড়ো বড়ো করে লেখা। টার্গেট গুলির মাঝে খানিকটা দূরত্ব ছেড়ে রাখা হয়েছে। সেখানে তিনটি 'ম্যাগাজিন রুম' বা 'সেনাখানা'- যেখানে গুলি-বন্দুক সাজানো থাকে। বাকি অংশে কর্দমাক্ত জলাভূমি। পাশে রাস্তা চলে গেছে বেলঘরিয়া স্টেশন থেকে নিমতা বিরাটি হয়ে যশোহর রোড পর্যন্ত। তার ওপাশে দমদম বিমানবন্দর। পথচারিদের নিরাপত্তার জন্যে উঁচু পাঁচিল দেওয়া। এই রাস্তার নাম আজ মধুসূদন ব্যানার্জি রোড। এ অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ পথ এটা।

স্বাধীন ভারতে সুভাষের পা রাখা হয়নি। কিন্তু চাঁদমারির লক্ষ্য যে ছিল ইংরেজদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করা, সেটা অর্জিত হয়েছে। যদিও অনেক যুদ্ধ, দাঙ্গা, দেশভাগ, রক্তক্ষরণের অধ্যায় এক একটা পর্বের মধ্যে দিয়ে পার হতে হয়েছে ইতিহাসকে। তাড়াতাড়ি দেশকে নতুন করে গড়ার কাজ শুরু করতে হয়েছে প্রায় শূন্য থেকে।

বিভাজিত বাংলা, তখন ব্যবহার করা হত 'পার্টিশন' শব্দটি, কেউ মেনে নিতে না পারলেও, লক্ষ-কোটি মানুষ বাধ্য হয় পূর্ব পাকিস্তানের দেশ, ঘর, ভিটেমাটি ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করে কলকাতার আশেপাশে নতুন করে বাঁচার লড়াই শুরু করতে। বাস্তুহারা এই মানুষদের সামান্য ভূঁইফোড়ের মতো আস্তানা দিতেও নবগঠিত সরকার অপারগ। অনাহারকে ও জানমালের আতঙ্ক কাটিয়ে, স্থিত হওয়ার লক্ষ্যে যে যেখানে যেমন ভাবে পারে একটু জমি দখল করে ঘর বসাতে শুরু করে। কলকাতার উত্তর দক্ষিণে জন্ম নেয় উদ্বাস্তু কলোনি। শহরতলি গড়ে ওঠার সেই আরম্ভ এবং ক্রম বেড়ে উঠল উত্তর ও দক্ষিণ শহরতলি। বেলঘরিয়া স্টেশন এলাকা ছিল পুরো ফাঁকা। একদিকে আড়িয়াদহ, দক্ষিণেশ্বর, অন্যদিকে নিমতা অঞ্চল বহু পুরনো হলেও বেলঘরিয়া, পুরনো নাম বেলঘর, ছিল খাঁ খাঁ – সন্ধের পর ভয় ভয় করত। একদিকে কিছু বাগানবাড়ি, একদিকে রামকৃষ্ণ মিশন, অন্যদিকে কিছু কারখানা – টেক্সম্যাকো, মোহিনী মিল প্রভৃতি।

চাঁদমারি ধূলিসাৎ হল – গড়ে উঠল যতীনদাস নগর কলোনি। ঠিক চাঁদমারি জায়গাটায় এখন স্কুল – একটা ছেলেদের একটা মেয়েদের। পাশে বান্ধবনগর কলোনি, সেটাকে দমদম ক্যান্টনমেন্ট এলাকা থেকে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। সেনাবাহিনীর জমি শক্ত হলেও, তাই তারাই উদ্যোগ নিয়ে দখল জমি বদল করেছিল।

নুভাষ এসব কিছুই দেখে যান নি। দেখলে হয়তো কষ্ট পেতেন কিছুতে, খুশি হতেন কিছুতে, অথবা আশ্চর্য হতেন অন্য কিছুতে। স্কুলে পড়াগুলো করে যে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, তাদের চাঁদমারি আলাদা – জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং সে পথ সহজ নয়, তারা জানে। একবার টার্গেট মিস করা, দুবার মিস... কিন্তু একবার তো লাগবেই। একজন মিস করল, বা দুজন মিস করল... কেউ না কেউ তো লক্ষ্যে পৌঁছবেই। পৌঁছে, ফিরে তাকালে দেখবে, মন্বন্তর, যুদ্ধ, দাঙ্গা, দেশভাগ – ইতিহাস পথটাকে যতই রক্তাক্ত করে রাখুক না কেন, একদিন পুষ্প বিকশিত হবেই। সে পুষ্পের নাম প্রাণপুষ্প।...

সাক্ষী

সব্যসাচি

গঙ্গার হাওয়াটা এই শেষ বিকেলবেলায় অনেকটা তীর বেঁধার মতো লাগে বুকে, মনে হয় যেন চামড়া মাংস ভেদ করে পাঁজরের হাড় গুলো কাঁপিয়ে দেবে;

তার উপরে বাগবাজার ঘাটটা ঠিক আর পাঁচটা ঘাটের মতো নয়, একটু বেশি গাছপালায় ঘেরা, একটু বেশি ছায়াময়, তাই ঠাণ্ডাটা যেন আরো বেশী লাগছে;

তবু এই ঘাটটায় এসে বসতে অনুরাগের বিন্দুমাত্র অসুবিধে নেই, কেন জানি না ঘাটটা ওকে বড্ড টানে; আর তাই ও এসে বসে থাকে এখানে, নতুন নতুন গল্প ভাবে।

অনুরাগ একজন নাট্যকর্মী, অভিনেতা বলে ও নিজেকে মনে করে না; ওর বক্তব্য ও অভিনয়ের অ্যাঁটুকুও জানে না, তাই নাট্যকর্মীটাই ওর পরিচয়, ওর কেলাবুকেও পেশা হিসেবে সেটাই লিখে রেখেছে।

প্রথমবার বাগবাজারের এই ঘাটে এসেছিলো দুই বন্ধুর পাল্লায় পড়ে, এসেছিলো শিরীশ মঞ্চে ওদের দলের একটা শো বুক করতে, কি মনে করে কাজটা সেরে চলে এলো বাগবাজার ঘাটে, আর আসার পর থেকে ও একটা জিনিস বুঝলো, এটা ওর শহরের সেই জায়গা গুলোর একটা, যেটা ওকে অনেক কিছু দেবে; যেমন ওকে অনেক কিছু দিয়েছে স্ট্রাটোর্ন লেন (পুরনো বই পাড়া), যেমন দিয়েছে পার্কস্ট্রিট সেমেট্রি, কিংবা ওর খুব প্রিয় ড্রিংক ব্রো, তেমনই এই ঘাটটাও

ওকে অনেক কিছু দেবে; আর সেই থেকেও প্রাত্যই চলে আসে এই ঘাটে, বসে থাকে ঘন্টাদুয়েক, হাতে সিগারেট নিয়ে দেখতে থাকে ছেলেরা জলে ঝাঁপ দিচ্ছে, সাঁতরে গিয়ে শক্তের গায়ে আটকানো টায়ার ধরে ঝুলছে, আবার চলে আসছে; দেখে কোনো এক অজানা ভদ্রলোক জাল ফেলে মাছ ধরছেন আর মিত্র'র ঘাট থেকে মায়ের ঘাটের দিকে যাচ্ছেন একটু একটু করে; এমন সব দৃশ্যও প্রাত্যই দেখে এখানে আর ভাবে, সত্যিই "এ দেশেতেই জন্ম, যেন এই দেশেতেই মরি", কলকাতায়ও বারবার জন্মাতে চায়, এই শহর টাও বারবার মরতে চায়, কারণ এটা এমন একটা শহর যেটা প্রতিদিন নতুন, প্রতি পলক্ষেপে নতুন, এটা এমন একটা শহর যেটার পুরোনো নতুন হেলাফেলাটা আজও বুঝতে পারেনি, অনেকের সাথে অনেক সময়ই ওর তর্কাতর্কি হয়েছে এ নিয়ে , কলকাতার আবার নতুন পুরোনো কি? কলকাতা কলকাতাই, ছিলো, আছে আর একশো বছর পরও ঠিক এমনটাই থাকবে; অন্ততও চায় না কলকাতা লন্ডন হোক, কোলকাতার রাস্তায় যদি বৃষ্টির জল না জমে; যদি রাস্তার ধারে ফুচকাওয়ালা না বসে; বাসে যদি লোক না ঝোলে, কিংবা শিয়ালদা স্টেশনের সামনে যদি লস্যি না বিক্রি হয়, দুররররররর) সেটা তো তাহলে আর সিটি অব জয় রইলো না, আর পাঁচটা শহরের মতোই কাঠ কাঠ হয়ে গেলো।

এসব ভাবতে ভাবতেও উঠে পড়লো,ঝিল থেকে ধুলো ঝেড়ে মায়ের ঘাটের দিকে রওনা দিলো, আজ ওর বাগবাজার স্টেশনের কাফেদের ক্যাকোফোনিটা পেরিয়ে মায়ের ঘাটের সামনে পৌঁছাতেই দেখলো জনা পঁচিশ লোকের ভিড়, একটা ছেলে, গায়ে সাদা থান জড়ানো; ওর থেকে বোধহয় বছর দুয়েকের বড়ো হবে; হাতে একটা মাটির সরা নিয়ে জলের দিকে যাচ্ছে, ব্যাপার টা বুঝতে দেরি হলো না, সদ্য পিতৃ কিংবা মাতৃহারা এই যুবক পূর্বপুরুষের অস্থিবিসর্জনের জন্য ঘাটের দিকে চলেছে; বাড়ির অন্যান্য অভিভাবকেরা নানারকম নিয়মের অনুশাসন চাপিয়ে দিচ্ছে ছেলেটার উপর; এটা কর্-ওটা নয়-এই হাতের উপর ওই হাত-কেমন একটা রাগ হলো অনুরাগের; কতটুকু তো একটা ছেলে; কতো আর হবে, বাইশ কি তেইশ, মুখটা দেখলেই বোঝা যাচ্ছে পাথর হয়ে আছে ভিতরটা, তার উপর সবাই এতো কিছু চাপিয়ে দেবে কেন? কেন?? উত্তর নেই ওর কাছে; ছেলেটা হাঁটু জলে নেমে গেলো, সরাটা উল্টে দিলো, একপাশা ছাই সরাটা থেকে বেরিয়ে পড়লো; স্রোতে ভেসে থাকলো মিত্র'র ঘাটের দিকেই; অনুরাগ দেখানটা দাঁড়ালো; ও ছেলেটার চোখ দেখতে পাচ্ছে; অনুরাগ জানে ছেলেটা ঠিক কি ভাবছে; ও ভাবছে ওর বাবা বা মা সেই স্রোতে সে ঘর থেকে দূরে চলে যাচ্ছে; ক্রমশ, স্রোতে ভেসে; আর কেউ দেখতে পাচ্ছে না, শুধু এই চলে যাওয়ার সাক্ষী থাকছে অনুরাগ, গঙ্গা, আর কলকাতার আকাশ... অনুরাগের কোনটা থেকে উঠলো, "কোন্ দিন খাঁচা পড়বে খসে, লালন কেঁদে কয়..."

নীতিগল্প : সারস ও শিকারি

শংকর কুণ্ডু

বিলের ধারে গাছ। গাছের ডালে এক সারস বসে বিলের জল জরিপ করছে আর মাছ ধরার প্ল্যান করছে।

এক শিকারি বন্দুকে গুলি ভরে তাক করছে তার দিকে। দেখে সারসটা কাতর গলায় বলল, আমাকে মেরো না। অনুরোধ। তোমার ক্ষতি হবে।

শিকারি হাসল, আমি শিকারি। শিকার আমার ধর্ম। নইলে ভিখারি হয়ে যাব।

সারস বলল, তুমি নিজে তো নিরামিষাশী। বাজারে গিয়ে আমাকে বেচবে। শুধু শুধু অন্যদের আমিষাশী করে তুলছ।

শিকারি অবাক, তাতে কী?

সারস বলল, নিজেকে অহিংস বলে জাহির করো। অথচ অন্যকে সহিংস হতে ইন্ধন জোগাও। এটা একরকম স্ববিরোধ।

শিকারি ট্রিগারে আঙুল রেখে হাসল, সবই তো জানেন দেখছি, সারস মহাশয়। এটা জানেন না, দুনিয়া স্ববিরোধে ভর্তি? বলা আর করা কারুরই মেলে না।

সারস চুপ। ঘাস জংগলে শিকারির বুট একপা এগিয়ে পজিশন নিল। এবার ট্রিগার টানার মুহূর্ত। কোত্থেকে একটা কাঁকড়া বিছে বুট বেয়ে উঠে লেজের হুলটা ফুটিয়ে শিকারির পায়ে বিষ ঢেলে দিল। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হল।

উঃ, মাগো- বলে শিকারি পড়ে গিয়ে ছটফট করতে লাগল। রাইফেল ছিটকে গেছে। শিকারি দেখতে পেল, বিশাল গলা মেলে সারসটা উড়ে আসছে তার দিকে – এক মুহূর্ত মনে হল যেন মৃত্যুর ছায়া!

বারণ করে ছিলাম কিনা, নির্বোধ সারসটা বলল।

আর্ত কণ্ঠে শিকারি বলল, আমায় মেরো না।

সারস বলল, না! মারব না। একটা কথা বলি। আমি কিন্তু অহিংস নই। মাছ মেরে খিদে মেটাই। মাছ খাবারেই যাচ্ছি। তার আগে একটা ছোট্ট কাজ করব। বলে ঠোঁট মেরে বাঁটপাটা ধরে রাইফেলটাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলল বিলের মাঝখানটায়।

ঝপাস আওয়াজ। ঢেউয়ের অজস্র বৃত্ত গুলো জল নিয়ে মিলিয়ে গেল খানিক পর। চারদিক আবার নিস্তব্ধ। শিকারি পা চেপে ধরে কাতরাচ্ছে। তার রক্তে বিষক্রিয়া শুরু হয়েছে।

বাসব দাশগুপ্ত

পৌষের কবিতা ১

তোমাকে বিষণ্ণ করে উড়ে গেল ভাসাভেলা একজন লোক
তুমি তাকে কতটুকু চেনো? কণ্ঠস্বরে হাত দিয়ে কোনদিন
বুকেতে ছেয়েছো তার জ্বালা? তাকে ছেড়ে সান্ধ্যভোজ কর,
প্রাচীন পুঁথির গায়ে চিঠি লেখ তুমি

#

আধা মাটি নদীর নাভের দাগে দারুন পীড়িত, মনে আসে
অত্যাদের বাসা ছিল, বহুকাল ধরে উন্মেষ পর্বের অর্থ বোঝনি,
যে তোমাকে প্রতিশ্রুতি দেয় চিরকাল তুমি তাকে বিশ্বাস করেছো,
আমার মালিক নেই, মানুষের দুই হাত বাড়িয়ে রয়েছে

#

জল জানে কেন তার এত ক্রোধ মাটির উপরে

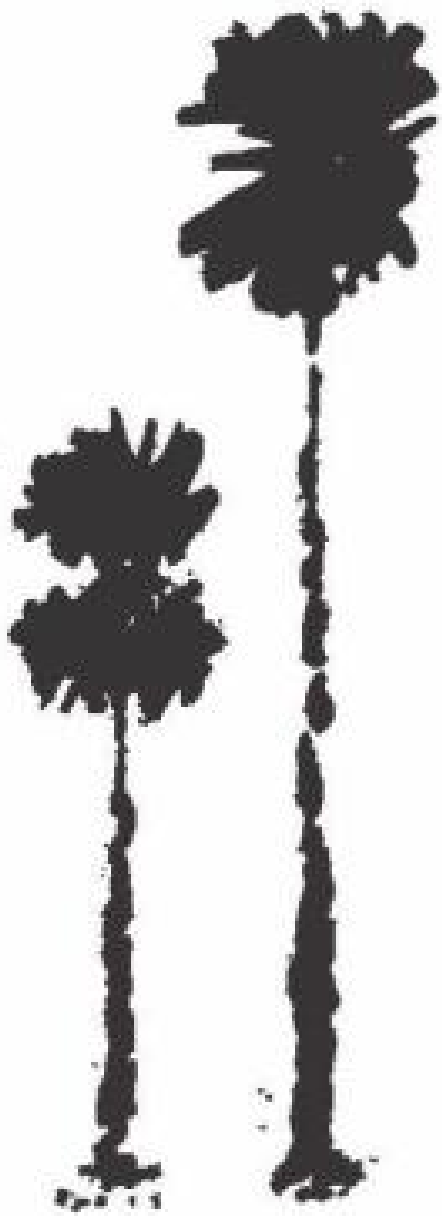

পৌষের কবিতা ২

তুমি যদি মার্জারের শাও হত তবুও তোমাকেই যাবজ্জীবন দেওয়া হল
তোমার এই ঘ্যান ঘ্যানে স্বভাব, কুঁচকানো ত্বক, অশক্ত হাড়
কিম্ভূত বিকেলে অসহ্য মনে হল

#

ছায়াগুলো ক্রমশ সরতে থাকে পড়ে থাকে অন্ধকার
এখন বন্দুক ধরতে না পারি, তুলি অন্ধকারে ডুবিয়ে
এঁকে যাই ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট

সুদীপ দাস

মুদ্রা থেকে চিহ্ন

সাদা নয় কালো নয় ধূসর অংশে থাকো
তোমাকে খুঁজতে আমি স্পাই লাগিয়েছি
অনন্ত মুদ্রার বিনিময়ে তারা উপরিতলের
খবর বলেছে আমি অসন্তুষ্ট মনে
এক লাইন সত্য দেখি সকলের বিজ্ঞ মুখে উথলে উঠেছে

তবুও অন্তরালোকে আমি বুঝি ধূসর অংশে তুমি অনাক্রান্ত আজও
হাজারো পাথর মরু অতিক্রমে অতিক্রমে শুয়ে আছো বালির ভিতর

কাঁকড়া খোঁজার ছলে হয়তো শিশুর কৌতূহল
একদিন নিশ্চয় মেটাবে তার হাতে ধরা কাঠকে পিঠিয়ে দিয়ে
তারপর সেই শিশু আমার সন্তান হয়ে ধু-ধু সমুদ্রতটে
কাঠি দিয়ে আঁকবে বিরাট কিছু গোল গোল চিহ্ন

কানামাছির গল্প

আমরাই দৃশ্য তবু অক্ষিতে আমরা নেই
চিন্তার দুর্যোগে যেন আমরা কেবল বলিরেখা
চিন্তাকে নায়ক করে এমনই স্বপ্ন দেখাও তুমি
যুগে যুগে ঘুরতে ঘুরতে
চিন্তাশক্তিরই গলা টিপে ধরে যদি।

উল্কা থাকলে তুমি দাহ্য পদার্থের মতো
হুউস্ করে এ আকাশে ও আকাশে আলো বিচ্ছুরণে
মেতে আছো, তারপর ক্লান্তির শাদা বিছানার পাশে
অনিবার্য দাঁড়ানোর কথা – সে তো আর বাণী নয়
নৈরাশ্যের তৃপ্তি, হাতছানি

অন্ধকারে দুঃখের সুড়ঙ্গ হয়ে একফোঁটা অশ্রু যেই কেশাগে জেগেছে
অমনি ক্ষমতা আর বিবেকের পরস্পর বিপরীত টানে
তোমার নৌকোর পেটে নদীঢেউ পরপর করে ওঠে
নৌকোর সাবেকী দেহ পেট্রলবাহিত স্পীডবোটে রূপান্তর হয়ে
ছুটে যায় লক্ষ্য করে দূর মরীচিকা

সোমনাথ ব্যানার্জী

একটি অস্পষ্ট ক্যানভাস

(১)

ট্রেনের বাঁশির শব্দে তাল মিলিয়ে বাড়ছে
হাকিমের বাজকথা, কিছু অব্যক্ত যন্ত্রণার !
অভুক্তীর সিগারেটের ধোঁওয়া নিয়ে ফেলে
বুলবুলের মতো মিলিয়ে যাচ্ছে সম্পর্ক
শুধু অবাস্তব কে আঁকড়ে ধরার ইচ্ছা এক

(২)

মন খারাপের জানলায় মৌসুমি-র আগমন
এবং সাগর শরীরে বাসা বাঁধছে নিম্নচাপ,
ঘুম থেকে উঠতে না চাওয়া,
স্বপ্নের কলকব্জা চোখের পাতায়...
একটি নিষ্কর্ম দিন,
দিন, প্রতিদিন, মাস...
শুধু বছর গুলোকে বছর না বলা

(৩)

এই রকম ভাবে শিশির-কে বৃষ্টি বলা,
নদীর স্রোত কে সুনামি,
তারপর ঝড়... ঝড়...

(৪)

নাম না জানা সাগরে ডুবে আছি
জলের উপরিতলে কে কাঠ কেটে আঁকছে
যেভাবে কুকুরটা ছুঁতে চেয়েছে আমার হা
বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে...

(৫)

একটা বন্যার প্রত্যাশা ক্রমশ...
রেকারির শেষ বাঁশি বেজে গেছে
সমস্ত বাজার বন্ধ,
এবার লুপ্ত হবে, মিসিং ...

(৬)

সমস্ত সাদা মেঘ সরিয়ে
তারা-রা উঁকি দিল
মনে হয় আকাশটা এখন নীল
কিন্তু চোখের ভুলে 'কালো'।
কালো, ধূসর, রক্তাক্ত... অপূর্ণ...

পাপান

সস্তা

আসজিতে খুলে থাকে বস্তাপচা পথ,
আর ঢেউ হারিয়ে সবুজ কমলামি বেশ্যা।
রাত বাড়লে শরীরে গন্ধ বাড়ে আতর এর,
প্রিয়তমা এ শহরের অলিগলি বড় সস্তা

আনাচে কানাচে জমে থাকা ধুলো,
ছোট কাঠটায় সংসারের ভারি ময়লা বস্তা।
ভিক্ষের বাটিতে খুচরো পয়সার গর্ব,
প্রিয়তমা এই জীবন বড় সস্তা।

ফুটপাথ কখনও স্বপ্ন দেখায় কখনও বা স্বর্গ,
আর কফি কাপে হাঁটে ফেলা ভালোবাসা।
ফেলা যদি চাহিদা পূরণ না হয়,
প্রিয়তমা এই ভালোবাসাও বড় সস্তা।

মৌসুমী মিত্র (বৈদ্য)

কলকাতা তারুণ্য একঝাঁক

কলকাতা অংশ ভরা রংগ,
কলকাতা মুঠোয় পড়া স্বর;
কলকাতা কখনও দেয় ধরা,
কলকাতা কখনও অধরা।

তোমার আমার সবার প্রিয়
নগর কলকাতা;
ভিক্টোরিয়া, চিড়িয়াখানা,
গড়ের মাঠ পাতা।

কলকাতা মহানগরীর সুখ,
কলকাতা বাংলা মায়ের মুখ;
কলকাতা মিটিং মিছিলে হাঁটে,
কলকাতা জমে ময়দানে মাঠে।

বিত্তবানের তিলোত্তমা
শহর কলকাতা;
বিত্তহীনের ভিন ঠাঁইহীন
স্থানহীন হয় মাথা।

কলকাতা ক্রিকেট-ফুটবল,
বৃষ্টিতে কোমর-ডোবা জল;
কলকাতা চিৎকার হৈচৈ,
পথঘাট লোকজন থৈথৈ।

আকাশবাণীর ঘুমভাঙা ভোর,
গরম চায়ের কাপ;
কেউ ফুটপাতে গড়ে সংসার,
কেউ ফায়ারপ্লেসে তাপ।

কলকাতা নিয়নবাতির জাঁক,
কলকাতা অজগলির ডাক,
তবু কলকাতা জীবনযুদ্ধে -
তারুণ্য একঝাঁক।।

বিশ্বরূপ দেবনাথ

গুচ্ছ কবিতা

(১)

চাই না এমনতর
চাঁদ
চন্দ্রিমায় স্নান করায়
বরং বলতে দিক শীতলতায়
খুলে দিতে পারি
নীরবতার ঝাঁপি।

(২)

আমার চাই – অপেক্ষা
হৃদয় জোড়া তোলপাড়
পথের ধারে থাকুক
জলকর
অবসন্ন পথিকের, দুরন্ত তৃষ্ণা।

(৩)

চলার পথে, পথের ধারে
খাঁ খাঁ করা পোড়াবাড়ি থাকে......
কান্না তোলা, কষ্ট হলে...
দাঁড়াও সেথায়
কান্না তোলা, কষ্ট হলে
কান্নার অপেক্ষায়।

(৪)

উল্টো থেকে সোজা হবার পর
সবাই এসেছিল, একে একে
বলেছিল- "ভালো থেকো"
কি এর অর্থ!
ওঁরা কি আশীর্বাদ করেছিল
না অভিসম্পাত।।

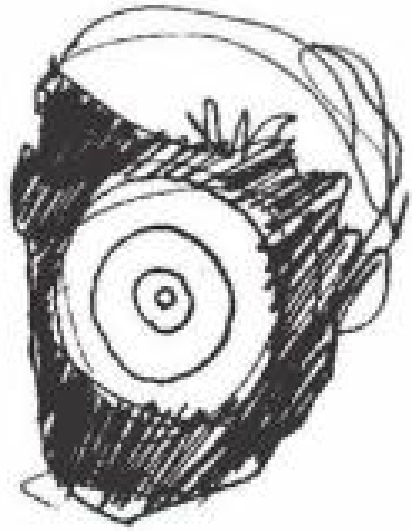

বিজয় দাস

সেদিন সবাই এসেছিল

সেদিন সবাই এসেছিল...
রাস্তা ঘেরা ব্যারিকেড
পথ আটকাচ্ছিল উৎসুক জনতার।
না! খবর মতো তেমন কিছুই ঘটেনি,
খবরের শিরনামে ওঁদের পক্ষেও
নিতান্তই অনুপযুক্ত...
পথ চলতি মানুষের, ব্যস্ততা থেকে
খরচ করা-
শুধু একটু দীর্ঘশ্বাস সম্বল,
আর অনেকটা বিরক্তি ও রাগে গজ্‌-গজ্‌।
অবিরত গাড়ির হর্ন, মাছির ভন্‌-ভনানি,
জমাট বাঁধা লোকের চাপা গলার ফিস্‌ ফিস্‌।

ওঁরা সবাই এসেছিল সেদিন
যেদিন এদের সবার বেশ ধরে,
ধর্মরাজ এসেছিল যমরাজের সাজে।।

কৌশিক চক্রবর্ত্তি

আফসোস

জানি তুমিও বুঝবে না
বোঝেনি সমাজ, বোঝেনি চারপাশ
সমস্ত বোঝা মাথায় নিয়ে হেঁটে গেছি পথ
কিছুটা রৌদ্র, কিছুটা ছায়ার মত আমার ভবিষ্যত।

#

আকাশের আছে আকস্মিকতা,
কিন্তু মেঘের তো মনখারাপ
বৃষ্টিরা হয়েছে ছুঁতো
হাত বাড়িয়েও পাইনি কোন হাত।

#

মনে মনে ভেঙে গেছি রোজ
ভেবেছি সব ছেঁড়ে ছুঁড়ে চলে যাব অন্যথা,
কিন্তু কোথায় গিয়ে জুড়বো নিজেকে?
নিরুদ্দেশের হাওয়ারা কি একটু অন্য ভাবে তাকায়?

#

বুঝিনি তোমায়, বুঝিনি নিজেকেও
শুধু বুঝেছি ঠেকে ঠেকে শেখা
সময় সে তো কারুর নয়-
তবুও অপেক্ষা যে-ই থাকা।

#

জানি তুমি অপেক্ষা করবে না
মনে মনে বলি করবেই বা কেন?
এমন তো নয় মানুষের অভাব পড়ে গেল...
তবুও কিছু অভাব বাকি থেকে যায় যেন...

#

কিছু মায়া ছাড়ে না কোন দিন
কিছু ভালবাসা ছেড়ে যায় না কোন রাত
কিছু মানুষ কিছু মানুষের জন্যই থাকে
বাদ বাকি কথা আজ তোলা থাক।

ফড়িং

সেই পোড়া আঠাশ দিন

রাত জাগে রাত, ঘুম খোঁজে খাট আর হাতড়ায় হাত।
স্বপ্নের ঋণ বাড়ছে প্রতিদিন,
পাশবিক মন হাসছে কতজন।

আছে মগজ ধোলাই? শুধরাবে কি সব?
ভাষা নেই কথা নেই হৃদযন্ত্রে গতি নেই,
করবে কীসের বিপ্লব?

কান্না পায় তবে সত্যিই চোখে জল আসেনা,
কষ্ট হয় তবে হাসতে সত্যি লজ্জা করে না।
তোমারও তো কষ্ট হয় তবে কষ্টের সীমা কি পার করে না?

আয়নার সম্মুখে মানুষ সাজে মানুষ হওয়ার তাগিদে,
বহুদিন বহুকাল সময়ের মায়াজাল,
ছায়া ভেবে ভুল করে অভুক্ত বলি তাকে...

শৈবাল মাইতি

কলকাতার বুকে আজ কেউ বমি করে দিয়েছে

কলকাতার বুকে আজ কেউ বমি করে দিয়েছে
ধনীর দুলালের কলের গাড়ি
নাম তার ন্যানো থেকে অডি
বমি করে দিচ্ছে তার সাইলেন্সর
তুমি দেখতে পাচ্ছ না ?
মাথের আকাশটা কালো হয়ে আসছে
না, চেরাপুঞ্জির তীব্র বর্ষণের মেঘ নয়,
সিসে কার্বন কণার পরিপুষ্ট লতিকা।
এবার এরা চেপে ধরবে মানুষের নলি
দম বন্ধ হয়ে আসবে শহরটার।

কলকাতার বুকে আজ কেউ পায়খানা করে দিয়েছে
একশ্রেণীর নয়, সর্বস্তরের মানুষ
গৃহকোণের অবাঞ্ছিত নোংরা থেকে
মধ্যরাতের বিছানায় ইউজড কনডম
নিরেনপক্ষে বাজার পটি।
সবারই শেষ আশ্রয় আজ এই শহরের মাটি।
না এ নোংরা যা তা নোংরা নয়
মুখের উপর জড়িয়ে আছে প্লাস্টিকের মুখোশ।
তুমি দেখতে পাচ্ছ না ?
মাটি হারিয়ে যাচ্ছে, সবুজ হারিয়ে যাচ্ছে
গড়ে উঠছে ধূসর কংক্রিটের জঙ্গল,
তারা চেপে বসছে কলকাতার বুকে
দম বন্ধ হয়ে আসছে শহরটার।

কলকাতার বুকে আজ কেউ পেচ্ছাপ করে দিয়েছে।
না, বাড়ির বাচ্চারা মজা করে
বিশ-তলা ইমারতের ছাদ থেকে মুতে দিচ্ছেনা
পথচলতি মানুষের মুখে।
আজ সবাই মুতছে কলকাতার মুখে,
সেই মুত গড়িয়ে পড়ছে গঙ্গার বুকে,
কারখানার যন্ত্রের মুত গড়িয়ে পড়ছে গঙ্গার বুকে,
কি নেই তাতে,
না কোনও ইউরিয়া না অ্যামাইনো অ্যাসিড।
তাতে যা রয়েছে তা রয়েছেই।
সেই মুত গিয়ে পড়ছে পুণ্যতোয়ার মুখে।

অমিতাভ সাহা

তোকে

নিশুতি রাতের অন্ধকারে,
তোকে ছুঁয়েছি আমি।
আমার কালের সর্বনাশে,
তোকে ছুঁয়েছি আমি,
কালো রাস্তার ভাঙা ল্যাম্পপোস্ট,
তোর গভীর নিশ্বাস
পেয়েছি আমি।
ভালোবাসা কিনা
কাছে আসা,
তোর শরীর মন
গভীর কালো অন্ধকারে,
ছুঁয়েছি আমি।
চিঠি লেখা, কোন কথা প্রেম
তোর ইমেল আর
তোর অরকুট, ফেসবুক,
তোকে ছুঁয়েছি আমি।
আমার রাতজাগা গান,
আর তোর রাতের স্বপ্ন
তোকে ছুঁয়েছি আমি।

মৌসম

জাতক

এখন দূরত্ব অনেক প্রকট,
ঝরে যাওয়ার সময়
ঘুম আলো ভরা
স্বপ্ন রঙিন সেপিয়া...

আমি মিথ্যে হবো
সব সত্যির ভিড়ে
যেখানে সব এলোমেলো
আপেক্ষিক পুরোটাই
দৃষ্টিমালা।

আর খানিকটা দূরত্ব তফাৎ বোধহয়!
তারপরই হয়ত সেই সীমাহীন
আকাশগঙ্গার সামিয়ানায়
বাঁধা হবো –
আগুন মেলে ধরতে।

চয়নজীব সুর

এই সময়

আমি বেঁচে আছি আর ভালো আছি,

রাত্তিরবেলা বাড়ির পাশে গুলি চলছে, কিন্তু
আমি... বহাল তবিয়তে আছি,

চোখের সামনে দুজন পড়ে মার খাচ্ছে, কিন্তু
আমি... ভালো আছি,

যারা স্কুলের গণ্ডি পেরোয়নি তারা তো
মাতব্বরি করছে,... আমি ব্যাপক আছি,

তুমিও ভালো আছো জানি, ভালো থেকো
আমার মতই কেবলা হয়ে...

সকাল বেলা ভাত আর শিঙি মাছের পাতলা
ঝোল নিয়ে অফিস যেয়ো

আর, সময় পেলে সবার পেছনে তেল
মাখিও... ওরা তোমাকে বাঁচতে দেবে...

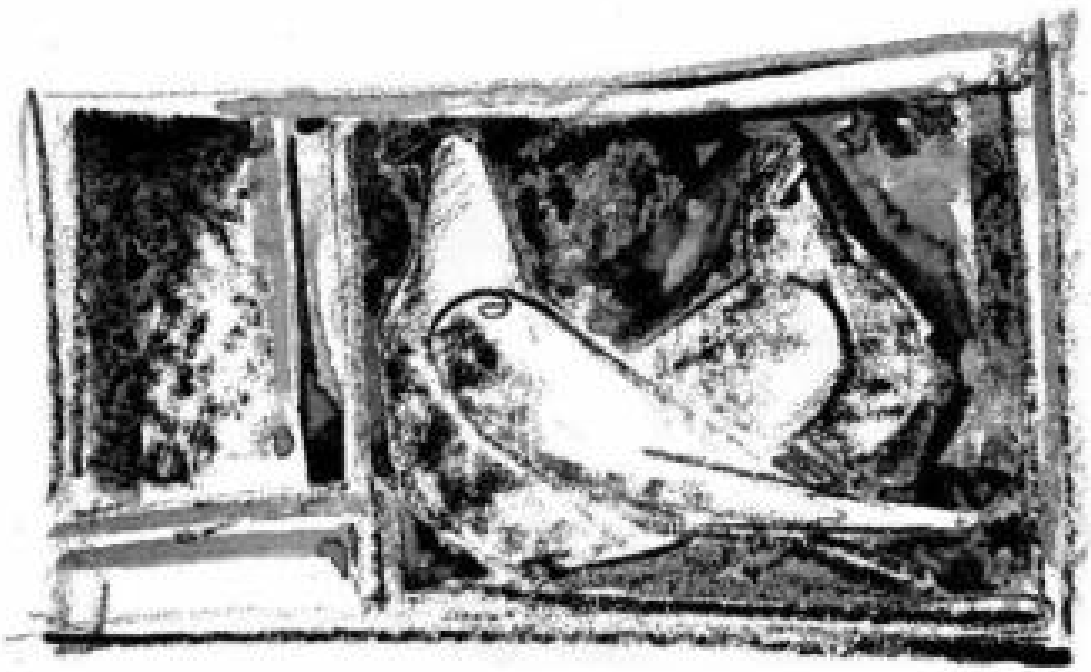

এমিলি ব্রন্টির 'উদারিং হাইটস'

নীরবতার অসমাপ্ত জগৎ

রাহুল দাশগুপ্ত

নৈঃশব্দের মধ্যে যখন শব্দ তৈরি হয়, তখন তার খেয়ালিপনার জন্য তাকে অভিযুক্ত করা যায় না। নীরবতার অসমাপ্ত জগতের মধ্যে শব্দগুলি তখন এলোমেলো ছুটে বেড়ায়। তাদের বেঁধে রাখা যায় না। শাসন করা যায় না। তাদের ওপর প্রচলিত নিয়ম-প্রথার কোনও জোর খাটে না। শব্দগুলি নিজের খেয়ালে এমন এক সমান্তরাল বাস্তবতা তৈরি করে, যার কোনও দায়বদ্ধতা নেই। সে দায়বদ্ধ কেবল তার বিচ্ছিন্নতা ও স্বাধীনতার কাছে। বিশ্বে খুব হাতে গোনা সাহিত্য রচনাই আছে, যারা উৎসারিত হয়েছে নিখাদ 'নিঃশব্দ' থেকে। এমিলি ব্রন্টির 'উদারিং হাইটস' সেই হাতে গোনা সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে পড়ে। এই সেই নারী যিনি গৃহস্থালীতে মনোনিবেশ করেন নি, নীড় ছেড়ে তিনি চলে গেছেন আকাশের দিকে। তাঁর উপন্যাস সেই কাল্পনিক বা মহাজাগতিক স্তরে পৌঁছেছে, যে স্তরে রয়েছে পরাবাস্তবতা বা তন্ময়তার উপস্থান।

এমিলি ব্রন্টির জন্ম ১৮১৮ সালের ৩০ জুলাই। আর মৃত্যু ১৮৪৮ সালের ১৯ ডিসেম্বর। তিনি ছিলেন 'জেন আয়ার' খ্যাত শার্লোট ব্রন্টির ছোট বোন। মায়ের মৃত্যুর সময় এমিলির বয়স ছিল মাত্র তিন। অল্প বয়স থেকেই এমিলি ছিলেন স্কট, বায়রন, শেলীর মুগ্ধ পাঠক। তিনি নিঃসঙ্গ ও বিচ্ছিন্ন জীবন পছন্দ করতেন। শুধু প্রকৃতি ও জীবজন্তুর প্রতি ছিল অস্বাভাবিক ভালোবাসা। 'উদারিং হাইটস' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৪৭ সালে, লন্ডনে। এই উপন্যাসে যে তীব্র আবেগ আর প্যাশন রয়েছে, তা সেইসময় পাঠকদের একদম চমৎকৃত করে দিয়েছিল। মাত্র ত্রিশ বছরে মারা যান এমিলি। একদিকে ভাইয়ের মৃত্যুর শোক, অন্যদিকে যক্ষ্মার আক্রমণ। তাছাড়া ডাক্তার দেখাতেও অস্বীকার করেছিলেন তিনি। মৃত্যুর সময় তিনি এতোই শীর্ণ হয়ে গেছিলেন, যে তাঁকে দেখলে লোকে চমকে যেত।

তুর্গেনেভের উপন্যাসের কথা ভাবা যাক। তাঁর সব লেখার উৎসেই 'শব্দ'। বা জাঁ পল সার্ত্র। শব্দের বিকৃত জগৎকে চাবকে সিধে করতে তিনিও নির্মাণ করেছেন খাঁটি শব্দ। তুর্গেনেভ বা সার্ত্র দায়বদ্ধ তাঁদের দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি। এমিলি ব্রন্টির এরকম কোনও দায়বদ্ধতা নেই। তাঁর দায়বদ্ধতা কেবল নিজের আত্মার কাছে। সেই আত্মাকে মেলে ধরার কাছে। সর্বসাধারণের বাস্তবতা, তাঁর স্থান-কাল-চরিত্রের সীমাবদ্ধতা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার কাছে। এবং সেই বিচ্ছিন্ন প্রাকারের সীমাহীন পরিধির বিস্তারে ব্যক্তিগত চৈতন্যের হিম ভেঙে ভেঙে শব্দের রোমান্টিক মুক্তি দেখার কাছে। এমিলি ব্রন্টি চৈতন্যের মুক্তি চান শব্দের কাছে। তার শব্দ চৈতন্য দিয়ে ঘেরা। তাই এই শব্দ বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন। সমান্তরাল ও স্বীকারোক্তিমূলক। খুব কম লেখকই তাদের চৈতন্যের জন্য এইভাবে বিচ্ছিন্ন ও সমান্তরাল একটি বাস্তবতাকে তৈরি করে নিতে পারেন। তারপর সেই স্বনির্মিত বাস্তবতার জমিতে খেয়ালখুশি মতো বুনে দিতে পারেন শব্দের চারাগুলি।

আর এখানেই এমিলি ব্রন্টির সঙ্গে অসম্ভব মিল আছে একজনের। হ্যাঁ, বিশ্বের মহত্তম ঔপন্যাসিক ফিওদোর দস্তয়েভস্কির কথাই আমি বলছি। দস্তয়েভস্কির লেখার উৎস মূলত 'শব্দ'। তারপর সেই 'শব্দ' থেকেই ধীরে ধীরে তৈরি হয় এক সীমাহীন নৈঃশব্দের জগৎ। সেই নৈঃশব্দের কেন্দ্র মুক্তি ঘটে 'শব্দে'র জগতে। দস্তয়েভস্কি তাঁর সমকালীন বাস্তবতা সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতন ছিলেন। তাঁর সমাজ-সংশ্লিষ্টতা তাঁর যেকোনও লেখার উৎস। কিন্তু সেই সমাজের শব্দময় সীমাবদ্ধ বাস্তবতায় নৈঃশব্দের অসীম জগৎ বিস্তার করে চলে তাঁর চরিত্রেরা। এই চরিত্রেরা আদপেই চরিত্র নয়, এরা প্রত্যেকেই এককেকটা 'আইডিয়া' বা 'ধারণা।' আর এই চরিত্রগুলির মধ্য দিয়েই মুক্তি ঘটে তাঁর আত্মার, ফিরে আসে শব্দের জগৎ। সীমাবদ্ধ বাস্তব-জগৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে জন্ম নেয় এক উত্তীর্ণ অসীম আধ্যাত্মিক জগতের।

দস্তয়েভস্কির 'ইডিয়ট' উপন্যাসটি ধরা যাক। 'প্রিন্স মিশকিন' চরিত্রটি একটি নিছক নির্দিষ্ট 'আইডিয়া।' দস্তয়েভস্কি এমন একটি চরিত্র সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, যার মধ্য দিয়ে স্বয়ং ঈশ্বর আত্মপ্রকাশ করবেন। এমিলি ব্রন্টি তৈরি করলেন এমন একটি চরিত্র, যার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করলো স্বয়ং শয়তান। তাই বলা যায়, 'ইডিয়ট' ও 'উদারিং হাইটস' —যেন বিশ্ব-উপন্যাসের দুটি বিপরীত প্রান্তবিন্দুতে অবস্থিত। মিশকিন ও হিথক্লিফ-একে অন্যকে সর্বদাই কেটে কেটে যাচ্ছে। তবে উপন্যাস দুটির মিল একটাই। দুটি উপন্যাসেরই লেখক আসলে 'ম্যান/ উওম্যান অব গড।' এমিলি ব্রন্টি চরিত্রায়িত করলেন শয়তানকে। অথচ তিনি 'উওম্যান অব গড।' এই আপাত-বিরোধিতার সমাধান খোঁজাই এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

উদারিং হাইটস আর থ্রাসক্রস গ্রাঞ্জ। পাশাপাশি দুটি জমিদার। 'উদারিং হাইটস'-আর্নশদের জমিদারি। থ্রাসক্রস গ্রাঞ্জের জমিদার লিনটনরা। বুড়ো আর্নশ'র এক ছেলে হিন্ডলে। এক মেয়ে ক্যাথারিন। লিনটনেরও দুই সন্তান। ছেলের নাম এডগার। মেয়ে ইসাবেলা। আর্নশরা খুব শক্তপোক্ত, মেজাজি আর আবেগপ্রবণ। লিনটনরা স্বভাবে নরম, রুগ্ন ও সংযমী। বুড়ো আর্নশ একবার লিভারপুল গেলেন। ফিরে এলেন একরত্তি এক শিশুকে নিয়ে। ছেলেটাকে দেখিয়ে আর্নশ বললেন, 'জিনিসটা এমন কালো যে মনে হবে শয়তানের কাছ থেকে পাওয়া।' কিন্তু এটিকে বাড়ির সবাইকে তিনি 'ঈশ্বরের দান' হিসেবেই গ্রহণ করতে বললেন।

'শয়তানের কাছ থেকে পাওয়া' অথচ 'ঈশ্বরের দান' —এই ছেলেটিই 'হিথক্লিফ।' তার নাম ওইটুকুই। তার কোনও পরিবার নেই, বংশপরিচয় নেই, জন্মাবধি সে জানে না তার আত্মপরিচয়, অর্থনৈতিকভাবেও সে নিঃস্ব। এক কথায়, শেকড়হীন একটি মানুষ। ছেলেটি শারীরিকভাবে অত্যন্ত শক্তিশালী, মানসিকভাবে জেদি ও একরোখা, তবে নিজের আবেগকে সংযত রাখতে পারদর্শী। বুড়ো আর্নশ মারা যাওয়ার পর পরিবারের নতুন মালিক হিন্ডলে তার ওপর ভয়ানক অত্যাচার শুরু করে। ভাগ্যের এই নির্মমতাকে সে মুখ বুজে সহ্য করে আর ভালোবাসে। তার সান্ত্বনা তার ভালোবাসা। তার প্রেম। আর এই প্রেমিকাটি হলেন হিন্ডলেরই বোন। ক্যাথারিন আর্নশ।

কিন্তু এবারও ভাগ্য নির্দয় হয়ে ওঠে তার প্রতি। এডগার লিনটন বিয়ের প্রস্তাব দেয় ক্যাথারিনকে। ক্যাথারিন জানে, তার ও হিথক্লিফের আত্মা একই রকম। এডগারের আত্মা আলাদা। যেমন, বিদ্যুৎ আর চাঁদের আলো আলাদা, যেমন আগুন আর তুষারে মিল নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে এডগারের প্রস্তাব গ্রহণ করে। কেননা, হিথক্লিফের সঙ্গে বিয়ে হলে তারা একজোড়া ভিখারি হবে। অতএব, 'একটা ফুলের টবে ওক গাছ বসিয়ে দেয়া' হলো, ওক গাছটি তরতরিয়ে বেড়ে উঠবে। ক্যাথারিনের সঙ্গে এডগারের বিয়ে হয়ে গেল। হিথক্লিফ পালিয়ে যায়।

তিন বছর পর হিথক্লিফ ফিরে এলো। তার এখন অর্থের অভাব নেই। আর আছে মাথাভর্তি পরিকল্পনা ও সাপের মতোই কুটিল বুদ্ধি। ক্যাথারিন যখন পাশে ছিল, হিথক্লিফ ছিল কপর্দকশূন্য। কিন্তু তখন সে ছিল সৎ, পরিশ্রমী ও সহনশীল। হিন্ডলের অমানবিক ব্যবহার নীরবে সহ্য করতো। এখন সে ধনী। অথচ, ক্যাথারিন তার জীবন থেকে চিরতরে হারিয়ে গেছে। সে এখন ভণ্ড, অধৈর্য, স্বার্থপর ও প্রতিশোধপরায়ণ।

সম্ভবত, ক্যাথারিনের সঙ্গে বাস্তবে তার মিলনের অসম্ভাব্যতাই তার প্রচণ্ড শক্তিকে জাগিয়ে দিল। হিথক্লিফ বুঝলো, ঈশ্বর অনেক বেশি নিষ্ঠুর। তুলনায়, শয়তানের করুণা অনেক দ্রুত ও সহজে পাওয়া যায়। সে তার ভালোবাসার জন্য শয়তানের কাছে সাহায্য চাইলো। কিন্তু শয়তান তার সঙ্গে ছলনা করলো। প্রচুর অর্থ হাতে পেয়ে সে ভাবলো, শয়তান তাকে আশীর্বাদ করেছে। সে ভুলে গেল, আশীর্বাদ করতে শয়তান অক্ষম, সে কেবল অভিশাপই দিতে পারে। তিনবছর পর

ফিরে এসে হিথক্লিফ সেই অভিশাপের প্রথম চিহ্নটিকেই প্রত্যক্ষ করলো।

হিথক্লিফ দেখলো, ক্যাথরিন বিবাহিত। এ জীবনে তাকে ফিরে পাবার আর কোনও সম্ভাবনাই নেই। অতএব মনে মনে সে ক্যাথরিনের মৃত্যুকামনা করতে শুরু করলো। হিথক্লিফকে দেখে ক্যাথরিনের মনেও জেগে উঠলো অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা। সে বুঝতে পারলো। এডগারকে সে ভালোবাসে না। অথচ তার সঙ্গেই কাটাতে হবে সারাটা জীবন। যাকে সে ভালোবাসে, সেই হিথক্লিফ তার চোখের সামনে ঘুরেফিরে বেড়াবে, অথচ কোনওদিন তাদের মিলন হবে না। তাছাড়া যে কারণে হিথক্লিফকে সে প্রত্যাখ্যান করেছিল, সেই কারণটিও আর কোনও গুরুত্ব নেই। হিথক্লিফ এখন ধনী। সামাজিকভাবেও যথেষ্ট প্রতিপত্তিশালী। অতএব, হিথক্লিফের উপস্থিতিই ক্যাথরিনের জীবনের আপাত শান্তিকে তছনছ করে দিয়ে সেখানে এক অনিবার্য ধ্বংসের গোপন ইশারাকে প্রোথিত করলো। একটু একটু করে ক্ষয়ে যেতে শুরু করলো ক্যাথরিন।

কিন্তু দ্রুত হিথক্লিফ বুঝতে পারলো, ক্যাথরিনের মৃত্যুর জন্য তার উপস্থিতিই যথেষ্ট নয়। উপস্থিতির পাশাপাশি প্রয়োজন তার অনুপস্থিতিও। আর লিন্টন পরিবারে নিজেকে গরহাজির রাখতে গেলে সর্বপ্রথম এডগারকে চটানো দরকার। সে প্রকাশ্যেই এডগারের বোন ইসাবেলার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় শুরু করলো। ইসাবেলাও উন্মাদ হয়ে গেল তার প্রতি। এডগারকে সে বাধ্য করলো ক্যাথরিনের সামনে তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে। এই ঘটনায় ক্যাথরিন প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়লো। যাকে সে ভালোবাসে, তাকে দেখতে পারছে না এমন একজনের জন্য যাকে সে ভালোবাসে না। এডগারকে সে ঘৃণা করতে শুরু করলো। হিথক্লিফের প্রতি দ্বিগুণিত হয়ে উঠলো তার প্রচণ্ড প্রেম।

অসুস্থ ক্যাথরিনকে সেবাশুশ্রূষা করে এডগারই সুস্থ করে তুললো। এডগারের এই সময়কার আচরণ আমাদের মনে করিয়ে দেয় মাদাম বোভারির অসুস্থতার সময় শার্ল বোভারির একনিষ্ঠ সেবাকে। হিথক্লিফ বুঝতে পারলো, ক্যাথরিনের মনের পুরনো আঘাতকে খুঁচিয়ে তুলতে না পারলে তার মৃত্যু হবে না। সে আবার ক্যাথরিনের সঙ্গে দেখা করলো। সদ্য সুস্থ ক্যাথরিনের মনে দেখা দিল প্রচণ্ড স্নায়ুবিক্ষোভ। তার মনে পুরনো আঘাতের স্মৃতি জেগে উঠলো। হিথক্লিফকে আবার হারাতে হবে ভেবে একদিকে সে যেমন প্রচণ্ড ভয় পেল, তেমনই এই বঞ্চিত প্রেমিকটির জন্য উদ্বেগ হয়ে উঠলো তার করুণা ও প্রেম। ভবিষ্যতের ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করে সে আতঙ্কে হিম হয়ে গেল। ক্যাথরিনের মৃত্যু হলো সেদিন রাতেই। হিথক্লিফ যা চাইছিল তাই পেল। ক্যাথরিনকে না পাওয়া ও চোখের সামনে তাকে অন্যের সংসার করতে দেখার যন্ত্রণা থেকে সে মুক্তি পেল। হিথক্লিফ নিজেও জানতো না, ক্যাথরিনের বেঁচে থাকাই ছিল তার কাছে শেষ সুযোগটুকু। ক্যাথরিনের মৃত্যু হিথক্লিফকে পুরোপুরি ও চিরতরে শয়তানের ক্রিতদাস বানিয়ে দিল।

ক্যাথরিনের মৃত্যুদৃশ্যে ওদের দু'জনকেই 'অদ্ভুত আর ভয়ংকর' মনে হয়। হিথক্লিফ সগর্বে ঘোষণা করে, 'ভগবান বা শয়তান-যে কোনও শক্তির ব্যবস্থাই করুক না কেন, কেউই বা কোনও কিছুই আমাদের বিচ্ছেদ ঘটাতে পারতো না।' পরেও হিথক্লিফের মনে হয়েছে, 'একদিন ও বেঁচেছিল এবং আমি ওকে হারিয়েছি – সারা দুনিয়াটাই ওর স্মৃতির এক ভয়াবহ সংগ্রহশালা।' মৃত্যুর ঠিক আগে ক্যাথরিনকে সে শুনিয়ে দেয়, 'তুমি যখন শান্তিতে থাকবে, আমি তখন অশেষ নরকযন্ত্রণা ভোগ করবো-তোমার পৈশাচিক স্বার্থপরতার জন্য এটাই কি যথেষ্ট নয়?'

ক্যাথরিনের মৃত্যুর পর এডগারের জীবন সম্পূর্ণ পালটে যায়। জীবন সম্পর্কে সে নির্মোহ হয়ে ওঠে। সন্ন্যাসীর মত দিন কাটায়। যত্নে, স্নেহে একমাত্র মেয়ে ক্যাথরিন লিন্টনকে মানুষ করে। এ যেন আরেক শার্ল বোভারির কাহিনী। ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখে অনুগতের মতো সে প্রকৃত সাহসের পরিচয় দেয়। কিন্তু, পত্নীবিয়োগের পর হিণ্ডলে আর্নশ'র পরিণতি হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন। ঈশ্বরের ওপর তার সমস্ত ভক্তিশ্রদ্ধা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অন্ধের মতো সে শয়তানকে বিশ্বাস করে বসে। একমাত্র ছেলে হেয়ারটন আর্নশের ভবিষ্যতকে নিজের হাতে বন্ধক রেখে যায় হিথক্লিফের কাছে। সে যখন মারা যায়, তার জমিদারির প্রতিটি ইঞ্চি তখন হিথক্লিফের কাছে বাঁধা। হিণ্ডলে ঈশ্বরের ওপর প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল। সে একথাও বলেছিল, 'যে সৃষ্টিকর্তা এই আত্মার সৃষ্টি করেছে সেই ব্যাটাকে শাস্তি দিতে আত্মাকে নরকে পাঠাবো।' নিজের আত্মাকে নরকে পাঠিয়ে সে চেয়েছিল আত্মার স্রষ্টাকে যন্ত্রণা দিতে।

হিথক্লিফও ঠিক তাই চেয়েছিল। যে জগৎ তার সঙ্গে কেবল বিমাতৃসুলভ ব্যবহারই করে এসেছে, তাকে সে শাসন করতে চাইল। স্মৃতির ভয়াবহ সংগ্রহশালার প্রতিটি সংগ্রহকে সে ঘৃণা করে। তাদের নিশ্চিহ্ন করে প্রতিটি সংগ্রহকে হত্যা করার অর্থ, নিজেকে ও নিজের

কেবল বেঁচে থাকা ক্যাথারিনকে একটু একটু করে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া। মৃত্যুর ঠিক আগে হিথক্লিফ তাই বলে, 'এ এক অদ্ভুত ধরনের হত্যা। ইঞ্চি ইঞ্চি করে নয়, তিল তিল করে মারা। আঠারো বছর ধরে বৃহত্তী আশা আমার সঙ্গে ছলনার খেলা খেলে চলেছে।' সে আরও বলে, 'হা ঈশ্বর কি সুদীর্ঘ এই সংগ্রাম এই যুদ্ধ শেষ হলেই বাঁচতাম!'

হিথক্লিফের যুদ্ধ শুরু হয় ক্যাথারিনের মৃত্যুর আগেই। ইসাবেলাকে প্রেমের অভিনয় করে সে বিয়ে করে। এডগারের সঙ্গে তার বোনের চিরকালের জন্য বিচ্ছেদ হয়ে যায়। বিয়ের পর সে চরম অত্যাচার শুরু করে ইসাবেলার ওপর। ইসাবেলা শেষ পর্যন্ত পালিয়ে গিয়ে নিজেকে রক্ষা করে। ইসাবেলার মৃত্যুর পর তার একমাত্র সন্তান লিনটনকে থ্রাশক্রস গ্রাঞ্জে নিয়ে এলো এডগার। কিন্তু পরদিনই হিথক্লিফ সবার অনিচ্ছায় তাকে নিজের কাছে নিয়ে গেল। হিথক্লিফের ইচ্ছা, লিনটনের সঙ্গে সে ক্যাথারিনের বিয়ে দেব। ক্যাথারিনকে সে ক্রমাগত প্ররোচিত করতে থাকে। এডগারের প্রচণ্ড অসুস্থতার সময় ক্যাথারিনকে ভুলিয়ে নিয়ে এসে জোর করে সে লিনটনের সঙ্গে তার বিয়ে দেয়। ক্যাথারিনকে না দেখে এডগারের অসুস্থতা প্রচণ্ড বেড়ে যায়। হিথক্লিফ তার সম্পত্তি আত্মসাৎ করতে পারে এই ভয়ে এডগার মৃত্যুর ঠিক আগে অ্যাটর্নি মিঃ গ্রিনকে ডেকে পাঠায়। কিন্তু মিঃ গ্রিন আসে এডগারের মৃত্যুর পরদিন সকালে। থ্রাশক্রস গ্রাঞ্জের মালিক হয়ে বসে হিথক্লিফ। কিছুদিন পর রোগে ভুগে বিনা চিকিৎসায় লিনটনের মৃত্যু হয়। ক্যাথারিনের শত অনুরোধেও হিথক্লিফ ডাক্তার কেনেথকে খবর দেয় না। নিজের ছেলেকে চোখের সামনে মরতে দেখে।

এইভাবে স্বামী ও স্ত্রী, সন্তান ও পিতা বা মাতা, ভাই ও বোন, জমি ও জমির মালিক, পাশাপাশি দুটি জমিদারিতে যেন এক সর্বগ্রাসী ঘৃণা ও বিচ্ছেদ নিয়ে আসে হিথক্লিফ। মানবিক সম্পর্ক ও জাগতিক নিয়মকানুনগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। প্রতিষ্ঠা হয় এক বীভৎস অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলার। সৃষ্টির আগের সময়ের সেই নৈরাজ্য ও বিভ্রান্তি যেন ফিরে আসে। আর শয়তানের এই রাজত্ব ফিরিয়ে আনতে হিথক্লিফ ব্যবহার করে দুটি অস্ত্র। কুটিল বুদ্ধি ও অপরিমিত অর্থ। বুদ্ধি থেকে আসে পরিকল্পনা ও তাকে কার্যকরী করে তোলার উপায়। অর্থ দিয়ে পরিকল্পনা সফল করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় মানুষ কেনা যায়।

প্রতিটি পাপকর্ম করার আগে হিথক্লিফ সদর্পে ঘোষণা করে। আপাত-অসম্ভব সেই ঘোষণাকে সে কার্যকর করে কখনও বা ভয় দেখিয়ে বা গায়ের জোরে, কখনও বা প্রেমিক বা শুভাকাঙ্ক্ষীর অভিনয় করে। নায়ক এবং প্রতি-নায়ক, দুটি চরিত্রেই হিথক্লিফ অনবদ্য। হিথক্লিফকে বাধা দেয় এলেন ডিন। আর্নশ পরিবারের সে পরিচারিকা, এই গল্পের কথক। দুই পরিবারের প্রত্যেককেই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সে দেখেছে। এই গল্পে এলেন ডিনই সেই চরিত্র যে সর্বদাই পাঠককে কোনটা সঠিক হতো তা বাতলে দেয়। সে শুভ বুদ্ধি ও চেতনার প্রতীক। কেবল হিথক্লিফ নয়, হিন্ডলে বা এডগার, দুই ক্যাথারিন-সবাই তার কাছে মন খুলে স্বীকারোক্তি করে, 'যারা হিথক্লিফ যা বলেছে তার প্রস্তাব ব্যর্থ করার মতো ক্ষমতা আমার নেই।'

হিথক্লিফের প্রভাব শেষপর্যন্ত প্রতিহত হয় হেয়ারটন আর্নশ ও ক্যাথারিন লিনটনের প্রেমের কাছে। সাধারণত নিজেকে ঘৃণিত করে তুলতে হিথক্লিফ পছন্দই করে। নিজের প্রতি এডগার ও ইসাবেলার মনে ঘৃণা এবং ছোট লিনটনের মনে ভয় জাগাতে পেরে সে খুশিই হয়। নিজেকে সফল মনে করে। কিন্তু মৃত্যুর আগে সেই হিথক্লিফ নিজেই পরিচয় নিয়ে বিব্রত বোধ করে। সে বোঝে, সবাই তাকে একটিই চোখে দেখে। সে শয়তান। তার গতি হবে নরকে। নিজের পরিচয় যতো স্পষ্ট হয় তার কাছে ততো সে দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে। হেয়ারটন ও ক্যাথারিনের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতা দেখেও সে বাধা দিতে পারে না।

হিথক্লিফ শেষপর্যন্ত মারা যায়। মৃত্যুর আগেও তার মধ্যে কোনও অনুতাপ দেখা যায় না। বরং সে সদর্পে ঘোষণা করে, 'অন্যায়ের জন্য অনুতাপের কথা বলছ... ধর্মের বাণীও শোনাতে হবে না।' মৃত্যুর পরেও অব্যাহত থাকে তার শয়তানি। কবরখোঁড়ার লোকটিকে ঘুষ খাইয়ে রাখে। ক্যাথারিনের কবরের পাশেই তাকে সমাধিস্থ করা হয়। মৃত্যুর আগেই সে বলেছিল, 'আমি খুবই সুখী... আবার যথেষ্ট সুখীও নই।' সে যে যথেষ্ট সুখী নয়, সেটা বোঝা যায়, যখন মৃত্যুর পরেও গাঁয়ের লোকেরা গির্জার কাছে, জলায়, বাড়ির কাছে ওদের দু'জনকে ঘুরে বেড়াতে দেখে। এই দুই প্রেতাত্মাকে ভয় পায় না কেবল হেয়ারটন আর ক্যাথারিন। এলেন ডিন বলে, একসঙ্গে থাকলে দুটিতে শয়তান আর তার দলবলের মুখোমুখি হতে পারবে।

হিথক্লিফের মৃত্যুর আগে ও পরে করা দুটি মন্তব্য থেকে তার চরিত্রটিকে আরও ভালো ব্যাখ্যা করা

যায়। তাঁর মৃত্যুর আগে এলেন ডিন বলেছিল, 'বিবেকের দংশনই হিথক্লিফের জীবনটা নরক করে তুলেছে। কীভাবে এর শেষ হবে, ভেবে পেলাম না আমি।' আর মৃত্যুর পর জোসেফ মন্তব্য করে, 'দেহ থেকে শয়তান মুক্তি পেয়েছে। মরা শরীরটা নিয়ে দর-কষাকষি চলছে। কি শয়তানকে বাবা...মরেও দাঁত খিঁচোচ্ছে।' হিথক্লিফের শরীর নিয়ে এই দর-কষাকষি যেন 'ফাউস্ট'-কেই মনে করিয়ে দেয়। হিথক্লিফ শয়তানের কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছিল। শয়তান তার সর্বশক্তি দিয়ে তাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে চূড়ান্ত সর্বনাশের দিকে।

এই সর্বনাশ চলে গোটা উপন্যাস জুড়ে। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে হিথক্লিফ সম্পর্কে করা বিভিন্ন মন্তব্য থেকেও এই সর্বনাশের আঁচ পাওয়া যায়। ইসাবেলা প্রশ্ন করে, 'হিথক্লিফ কি মানুষ? মানুষ হলে সে কি উন্মাদ? তা না হলে, সে কি শয়তান?' এলেন ডিনের মনেও প্রশ্ন, 'এ কেমন অপরাধ যা নিয়ে মানুষ বছরের পর বছর বয়ে মরে, প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষায় জ্বলতে থাকে আর এই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্য নানা পরিকল্পনা করে, মনে একটুও অনুতাপ জাগে না?' ক্যাথরিন লিন্টনের জিজ্ঞাসা, 'আমরা এই জেনে প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা মেটাব-আপনার এই নিষ্ঠুরতা আরও গভীর কোনও দুঃখ থেকে এসেছে। আপনি খুবই দুঃখী? তাই না? শয়তানের মতো নিঃসঙ্গ, শয়তানের মতোই ঈর্ষায় কাতর-তাই তো? আমি আপনার মতো হতে চাই না।'

শরীর মৃত্যুশেষেই হিথক্লিফ তার আত্মাকে নরকে পাঠাতে চেয়েছে। তার নিঃসঙ্গতা ও ঈর্ষা-তাকে টেনে নিয়েছে নরকের দিকে। সে ভেবেছে, এইভাবে সে শেষ একটা শোধ তুলেছে আত্মার হন্তার ওপর। কিন্তু হন্তার মুখোমুখি হওয়ার এই প্রচণ্ড শক্তি ও আত্মবিশ্বাস সে কোত্থেকে পেলো? কোত্থেকে সে পেল বিরল ভাগ্যকে শাসন করার এই বিরাট স্পর্ধা? কোন বিরল সাহসে সে প্রতিটি পাপকর্মকে আগে নিজের সিদ্ধান্তকে ঘোষণা করতো, তারপর ঈশ্বরের মতোই প্রচণ্ড কুশলতা ও নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে প্রতিটি মানুষ ও পরিস্থিতিকে বাধ্য করতো সেই সিদ্ধান্তের অভিমুখে চালিত হতে?

আমাদের মনে পড়ে সফোক্লেসের বিখ্যাত নাটক 'রাজা ইডিপাসে'র কথা। জন্মাবধি ইডিপাস ভাগ্যবিড়ম্বিত, আত্মপরিচয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্ধকারে। অ্যাপোলোর অভিশাপের সে অসহায় শিকার। ইডিপাস নিজের ভাগ্যকেই চ্যালেঞ্জ করে। তারপর প্রচণ্ড শক্তিতে একের পর এক সূত্রো ছিঁড়ে উদ্ঘাটিত করে আত্মপরিচয়ের রহস্য। উদ্ঘাটিত হয়, তিনি ঈশ্বরের প্রতিনিধি। মানবতার জন্য বলিপ্রদত্ত। তাই বিকল শরীর সমস্ত পাপের ভার একা তাকেই বহন করতে হবে। হিথক্লিফও নিজের পরিচয় উদ্ঘাটিত করতে ভয় পায় না। সে জানে, সে শয়তানের প্রতিনিধি। এটাই তার আত্মপরিচয়। আখ্যানের পরত খুলে খুলে তার পরিচয়ের প্রতিটি অংশ একটু একটু করে প্রকাশ হয়ে পড়ে। প্রতিটি পরত খোলার আগে পাঠকের সামনেই হিথক্লিফ সেই উদ্ঘাটনের মুহূর্তটি ঘোষণা করে।

হিথক্লিফ হেরে যায়। জিতে যায় হেয়ারটন ও ক্যাথরিন। হেয়ারটন আর্নশ ফিরে পায় উদারিং হাইটস। ক্যাথরিন লিন্টনও ফিরে পায় থ্রাশক্রস গ্রেঞ্জ। হিথক্লিফের ভালোবাসা তাকে টেনে নিয়ে গেছিল শয়তানের দিকে। হিথক্লিফের দু'পা ফিরিয়ে দিল প্রেম, আনন্দ ও শান্তি। হেয়ারটন ও ক্যাথরিন সেই অন্তরের ও স্বর্গের প্রতিনিধি। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হিথক্লিফ তাই বলে ওঠে, 'কাল রাতে আমি নরকের দরজায় পৌঁছে গিয়েছিলাম। আজ আমার স্বর্গের দেখা পেয়েছি। স্বর্গের দিকেই আমার দৃষ্টি এখন-মাত্র তিন ফুটের ব্যবধান।' হিথক্লিফের মৃত্যু এবং হেয়ারটন ও ক্যাথরিনের ভালোবাসা সে ব্যবধানকেই ঘুচিয়ে দিল।

আসলে এমিলি ব্রন্টি এই স্বর্গকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। শয়তানের জন্য তাই তিনি এক দীর্ঘ অথচ অনিবার্য শাস্তি নির্দিষ্ট করেছেন। দস্তয়েভস্কি 'মিশকিন' চরিত্রের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে চরিত্রায়িত করতে চেয়েছিলেন। দেখাতে চেয়েছিলেন মানবতার জন্য তার আত্মবলিদান। উপন্যাসের শেষে মিশকিনের নিঃস্বতা ও নির্বাসন সেই বলিদানেরই অংশ। এমিলি ব্রন্টি দেখিয়েছেন শয়তানের নিঃসঙ্গতা ও তার পরাজয়। দেখিয়েছেন তার মৃত্যু ও নিঃস্বতা। শয়তানকে বলি দিয়ে। তার আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে এবং তার জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করে তিনি শুদ্ধ বসবাসযোগ্য করে তুলতে চেয়েছেন মানুষের দুনিয়াকে। শয়তানকে চরিত্রায়িত করলেও ব্রন্টি তাই দস্তয়েভস্কির মতোই, 'উদ্যান অব শক।'

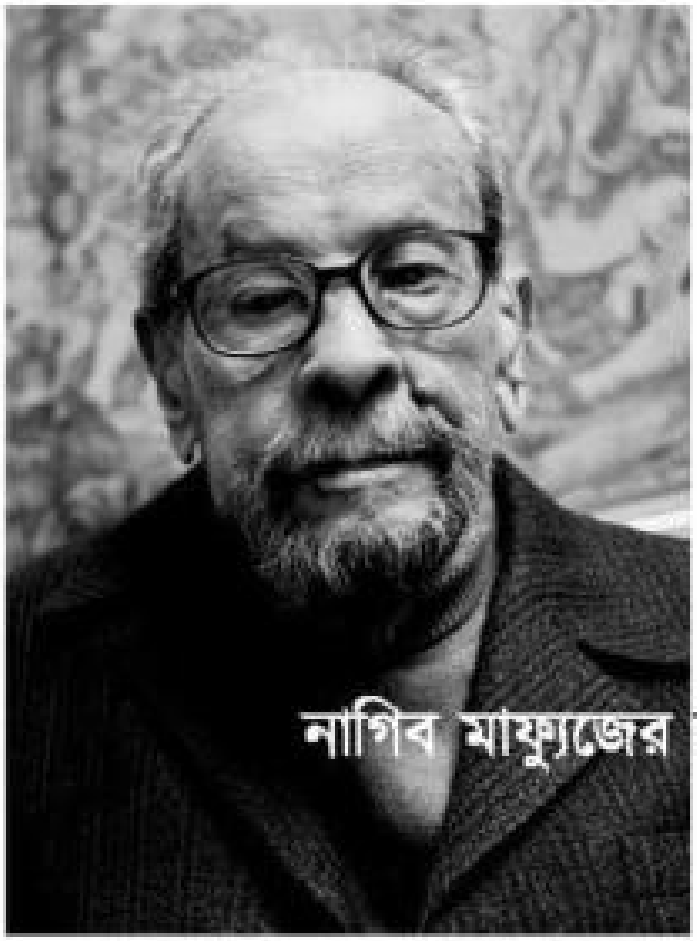

নাগিব মাফ্যুজের জীবনচক্রের দলিল ও

একটি অর্ধেকদিনের খসড়া

শুভংকর গুহ

নিজের দেশ ইজিপ্টে, তিনি প্রধানতম লেখক হয়ে উঠলেও, আন্তর্জাতিক স্তরে তখন পরিচিত ছিলেন না। ১৯৮৮ সালে, সুদীর্ঘ পনেরোশো পাতার উপন্যাস, 'কায়রো ট্রিলজি'-র জন্য নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পরবর্তীকালে, আন্তর্জাতিক স্তরে তাঁর খ্যাতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। শুধু তাই নয়, গোটা বিশ্বে বিংশ শতাব্দীর একজন প্রধানতম লেখক হয়ে উঠলেন। উল্লেখ প্রয়োজন, নাগিব মাফুজই আরবি ভাষা সাহিত্যের প্রথম লেখক, যিনি প্রথম নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হলেন। নাগিবের পুরস্কারের সাথে সাথে আরও একটি অসম্ভব কাণ্ড ঘটে গেল- সমগ্র উত্তর আফ্রিকা বিশেষ করে সুদান, সেনেগাল, আলবিনিয়া, আলজিরিয়া, ইথিওপিয়া এবং ইজিপ্ট – সমস্ত দেশগুলির সাহিত্য চর্চা বিশ্ববাসীর দ্রুত নজরে এল। নাগিব মাফুজ ১১ ডিসেম্বর ১৯১১, একটি মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারে, কায়রো শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ৩০ আগস্ট, ২০০৬ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। বার্ট্রান্ড রাসেল এবং হলডেন লাক্সনেস- এর পরে নাগিব মাফুজ হলেন তৃতীয় বৃদ্ধ, যিনি নোবেল লরিয়েটদের মধ্যে সর্বাধিক জীবিত ছিলেন। পঞ্চাশটি উপন্যাস, তিনশো পঞ্চাশটি ছোটগল্প, ডজনখানেক চিত্রনাট্য, পাঁচটি নাটক, এ ছাড়াও প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা, সংবাদধর্মী নানান লেখা, ইজিপ্টের জাতীয় জীবনে নানান কাজ ও ইসলাম ফান্ডামেন্টালিস্টদের বিরুদ্ধে তাঁর নিরন্তর সংগ্রাম, - কায়রো বাসভবনের সামনে তাঁকে হত্যা করার জন্য আক্রমণ, ঘাড়ে চাকুর ঘা-এ রক্তাক্ত হয়ে লুটিয়ে পড়া, দীর্ঘকাল বিছানায় শয্যাশায়ী , হাতগুটি অকেজো হওয়ার ফলে, লেখালেখির কাজ করতে পারতেন না।ইজিপ্টের রাষ্ট্রপতি হোসনি মুবারক নাগিব সম্পর্কে বলেছেন, - "মাফুজ ছিলেন আমাদের সাংস্কৃতিক আলো... যিনি আরব দুনিয়ার সাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে হাজির করেছিলেন, মুক্তবোধের দ্বারা নিপীড়িত হয়ে, নিজের সৃষ্টির মাধ্যমে আরব দুনিয়ার সম্পর্ককে গভীর করে তুলেছিলেন। চরমপন্থীর সঙ্গে তাঁর নিরন্তর সংঘর্ষ আমাদের অনুপ্রেরণা।" নাদিন গার্ডিমার নাগিব সম্পর্কে বলছেন-" একজন মহৎ সৃষ্টিশীল প্রতিভা, বিশ্ব উপন্যাস সাম্রাজ্যের।" ১৯৮৮ নাগিব নোবেল বক্তৃতায় আমাদের জানাচ্ছেন- "দয়া করে, আপনারা সহনশীলতার সঙ্গে আমার এই কথাটি শুনবেন, যে ভাষায় আমি সাহিত্য চর্চা করে সম্মানিত হলাম, এই ভাষাটি সম্পর্কে আপনারা সম্ভবত বিশেষ কিছু জানেন না, কিন্তু এই ভাষাটিই আজকে প্রকৃত জয়ী। এই ভাষাটির সাংগীতিক মূর্ছনা আপনাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির মরূদ্যানে আছড়ে পড়বে।"

নাগিব মাহফুজ সম্পর্কে প্রচলিত ও বহু প্রাসঙ্গিক কথাটি, বাস্তবে পরিবেশন আশা করি মার্জনীয়। কেন না, বহু প্রচারিত তথ্যটির দর্শন 'অর্ধেক দিন' বা 'অর্ধেক দিবস' অর্থাৎ 'Half a Day' যার মাত্র পাঁচ পৃষ্ঠার এই গল্পটির সঙ্গে রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। বিশ্বের বিখ্যাত ছোটগল্পের দরবারে 'অর্ধেক দিন' গল্পটির খ্যাতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়া বিস্ময়কর। গল্পটি ইংরেজিতে অনুবাদ হওয়ার সাথে সাথে আন্তর্জাতিক স্তরে দুনিয়ার সাহিত্য সমালোচক ও পণ্ডিতদের নজরে আসে। বিশেষ করে, ইউরোপের তরুণ চলচ্চিত্র পরিচালকরা গল্পটি সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করেন। সমাজবিজ্ঞানী, ইতিহাসবিদ, দার্শনিক তত্ত্ববিদ ও সাহিত্য সাংবাদিক গল্পটির প্রতি তাদের নিজস্ব আদর গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। আরবি ভাষায় গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮৯ সালে। গল্পটি নাগিবের প্রায় শেষ জীবনপ্রান্তে রচিত। একজন বিখ্যাত অস্তিত্ববাদী প্রকাশ্যেই স্বীকার করেছেন, "মানবজীবন একটি অর্ধেক দিনেই সমাপ্ত, এই কথা জেনে বিস্ময় প্রকাশ করছি।" অনেক উত্তর আধুনিক তত্ত্ববিদ 'অর্ধেকদিন' গল্পটিকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। আবার অনেকে বলছেন গল্পটি একটি মানবজীবনের বেদনাময় কাহিনি। গল্পটি এই সময়ের সর্ব উৎকৃষ্ট পরীক্ষামূলক রচনা হিসেবে স্বীকৃত নাগিব মাহফুজের ওপরে বিশিষ্ট সমালোচক দ. এনানি জানাচ্ছেন – "সংক্ষিপ্ত আখ্যান, এটি লেখকের একটি ক্ষমতাসম্পন্ন ও গুরুত্বপূর্ণ রচনা, আরব দুনিয়ার স্মৃতি সংক্রান্ত সময়ের সাথে বর্তমানের পর্যবেক্ষিত সময়ের সাথে তর্কসাপেক্ষ আদানপ্রদান।" 'অর্ধেকদিন' গল্পটি একটি বোধ, ব্যাখ্যাতীত শব্দসূচক কথা, যেখানে কথকের দ্বারা বিবরণে প্রতিটি বিষয়-শব্দ প্রতীকী, যা কিনা মানবজীবন চক্রের গভীর অর্থবহন করছে। গল্পটির মধ্যে সবকিছু বর্তমান, সাধারণ থেকে অতি সাধারণ কথা প্রতিনিধিত্ব করছে মানবিক অবস্থানের পক্ষে- জন্ম, শৈশবকাল, বৃদ্ধকাল, মৃত্যু, ধর্ম, প্রেম, বন্ধুত্ব, বেদনা, আনন্দ, ভয়, শিক্ষা, স্মৃতি, আকুলতা এবং প্রজন্মের পর প্রজন্মের বিবর্তনবাদ।

প্রথমে গল্পটি সংকলিত হয় 'The False down' নামক একটি সংকলনে ১৯৮৯ সালে, আরবি ভাষায়। পরবর্তীতে ১৯৯১ সালে গল্পটি 'The time and the place' একটি ইংরেজি সংকলনে। গল্পটি পড়ার আগে নিশ্চিত হতে হবে, দক্ষিণ, মধ্য ও উত্তর আফ্রিকার গল্প কথকের বা ন্যারেটরের পার্থক্যগুলি। সমগ্র উত্তর আফ্রিকার মৌখিক উচ্চারিত প্রাচীন সাহিত্যের ধারাটি গল্পটিতে অনুসরণ করা হয়েছে।

প্রাচীন উত্তর আফ্রিকাতে মৌখিক উচ্চারিত প্রাচীন সাহিত্যের ধারাটি গল্পটিতে অনুসরণ করা হয়েছে। প্রাচীন উত্তর আফ্রিকাতে মৌখিক উচ্চারিত সাহিত্যের ধারাটি কখনও গদ্যের ভঙ্গিতে, কখনও আবার পদ্যের ভঙ্গিতে বা সংগীতের ভঙ্গিতে পরিবেশন করা হত। কথায় কথায় ধর্মীয়, ঐতিহাসিক, অথবা প্রেম বা অলৌকিক গল্প শোনানোর প্রচলন ছিল। উত্তর আফ্রিকাতে কথক প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে গল্পের জাল বোনার কাজটি করত। কথাকে পদ্যে রূপান্তর করে, বিভিন্ন সাংগীতিক সুরে পরিবেশনের রেওয়াজ ছিল। ফ্যারাও শাসনকালের মহাকাব্যিক আখ্যান, জীবিকাধর্মী গদ্য, আসর অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বিধিনিষেধ ধর্মীয় নির্দেশ, শাসনকর্তার প্রতি প্রশস্তিমূলক সংগীত, কুইন্সেপ্ট ও প্রধান ও প্রকট ব্যক্তির মহানুভবতার প্রচার করতে করতে কথকেরা নীলনদের পাশ দিয়ে হেঁটে হেঁটে গ্রামের পর গ্রামে অবস্থান করে, উপার্জন করতো। নীল নদ-ই একমাত্র নদ যা গোটা চার-পাঁচটি দেশ অতিক্রম করে মিশরের আলেকজান্দ্রিয়াতে পৌঁছে ভূমধ্যসাগরে বিলীন হয়েছে। আলেকজান্দ্রিয়ার আগে আসোয়ান, যেখানে বাঁধ নির্মাণ কাজটি নিয়ে গ্রেট ব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স অবশেষে রাশিয়া ক্ষমতার লীলায় মত্ত হয়েছিল। অনেকেই জানেন মিশর বা ইজিপ্টেই নীলনদের ব্যাপ্তি, কিন্তু নীলনদ সুবিস্তৃত একমাত্র সুদানেই। সেই কারণে, প্রাচীনকাল থেকে ইজিপ্টের সাথে সুদানের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক যোগসূত্র গভীর। কাজেই আধুনিক কালে ইজিপ্ট ও সুদানের লেখকদের আখ্যানধর্ম একগোত্রীয়। প্রাচীনকালে প্রশস্তিবাদী গায়কেরা বাদ্যযন্ত্রের সাথে আবৃত্তি করে শোনাতেন,- প্রেমের গান, প্রার্থনাসংগীত, শিকারগীত প্রভৃতি। সোয়াহিলি ভাষার প্রায় তিন লক্ষ পাণ্ডুলিপি উদ্ধার হয়েছিল, সেইগুলি ইজিপ্টের বিভিন্ন সংগ্রহশালায় বা ব্যক্তিগত সংগ্রহে সংরক্ষিত। পাণ্ডুলিপিগুলি মূলত আরবি ভাষায় রচিত। জ্যোতির্বিদ্যা, কবিতা, আইন, ইতিহাস, বিশ্বাস, রাজনীতি বিষয়ক। 'জাদুকর কাহিনি' প্রাক্ ঔপনিবেশিক সময়ে 'আলদুম' আরবিভাষায় বিশেষ যোগ্যতা প্রমাণ করেন। 'জাদুকর কাহিনি' রচনাটি 'সোয়াহিলি' ধারার অন্তর্গত। অশ্বারোহী যেমন নিজের শাসিত পরাধীন অশ্বকে খুঁটে পানি পান করিয়ে দেয়, নাগিব তেমনই আফ্রিকার পরাধীনকালিন বা ঔপনিবেশিক কালকে ক্ষোভের সঙ্গে প্রকাশ করেছেন। অথচ প্রাচীন ইজিপ্টের ঐতিহ্যশালী মোটিফগুলি চিত্ররূপে প্রথিত ছিল, প্রথিত ছিল নানান ইসলামিক আখ্যানগুলি। পরবর্তীকালে তাই তিনি

জানিয়েছিলেন, সলমন রুশদির 'স্যাটানিক ভার্সেস' ইসলামকে অপমান করেছে। ১৯৫০ থেকে ১৯৫৬ সাল গোটা আফ্রিকার উপনিবেশ শাসন থেকে মুক্তির কাল। শাসনকর্তার আমূল পরিবর্তন সত্ত্বেও উপনিবেশ পরবর্তী শাসনকালে ন্যারেটিভ ধারাপ্রবাহ হল। সমকালীন লেখকরাও ন্যারেটিভ ধারাকে অনুসরণ করে, গোটা বিশ্বের নজর কেড়েছে উত্তর আফ্রিকা। কথকের কথা বলার ভঙ্গিতে সাহিত্যের পাঠক খুঁজে পেল এক নতুন স্বাদ।

মিশরীয় বা ইজিপশিয়ান প্রাচীন ন্যারেটিভ ধারাকেই নাগিব মাফুজ 'অর্বেকমিন' গল্পটিতে প্রয়োগ করলেন। নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পরে ভিষ্টর জাহরকে একটি সাক্ষাৎকারে নাগিব মাফুজ জানাচ্ছেন,- "যদিও আমার শিশুকালে, আমি খুব একটা সুখী ছিলাম না, কারণ বিদ্যালয় আমার কাছে কয়েদখানা থেকেও বেশি কিছু মনে হত।" নাগিব সেই শিশু অবস্থা থেকে উঠে এসে কাহিনিটিতে নিজেই কথকের ভূমিকা পালন করলেন। মানবজীবনের শুরু থেকে বৃদ্ধাবস্থায় পৌঁছে যাওয়ার একটি বেদনাদায়ক ভ্রমণ কাহিনিই হল 'অর্বেকমিন' গল্পটি কেন্দ্রীয় ভাবনার মলাট। ইংরেজিতে অনুবাদ হওয়ার সুবাদে গল্পটির আয়তন মাত্র পাঁচ পাতা। এই স্বল্প আয়তনের মধ্যে কায়রো শহরের আধুনিক সংস্কৃতি ও সভ্যতার নানা অলিগোরিকাল বিন্যাসের চমৎকার উপস্থাপন। গল্পটির সূচনা এইভাবে, একটি শুনে ছেলে সে তার প্রথমদিনের বিদ্যালয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতার বিবরণ দিচ্ছে। আপাত সে একজন বেদনাময় বিবরণকারী হলেও সমগ্র গল্পটিতে সে আশ্চর্যজনক মৌনতা অবলম্বন করেছে। প্রাচীন ইজিপশিয়ান স্থাপত্যগুলি যে নীরবতা আদি অনন্তকাল ধরে বহন করে আসছে গল্পটির ন্যারেশনের অন্তরালে সেই জমাট নীরবতা অনুভূত হয়। কথক মানে ছেলেটি বিদ্যালয়ে যাওয়ার প্রথমদিন নিজেই সে উচ্ছ্বসিত হয়, কেননা সে নতুন পোশাক পরেছে। নতুন কালো জুতো। সবুজ ইস্কুলের জামা আর লাল ফেজটুপি। কিন্তু তার উচ্ছ্বাসটি মুহূর্তের মধ্যে মাটি হয়ে যায়, যখন সে জানতে পারল সত্যিই দিনটা কোনো উৎসব বা পরবের দিন নয়, নিছকই সেটি বিদ্যালয় বা স্কুলে যাওয়ার প্রথম দিন। ছেলেটির মা নিষ্পলক তাকিয়ে ছিল জানলা দিয়ে, ওদের দিকে। সে বাবার হাতটি ধরে হাঁটছিল। লক্ষণীয়, কথক নিখুঁত ভাষা ব্যবহার করছে, সাহায্য নিচ্ছে নিখুঁত ডিটেলিংয়ের। বাগান, অট্টালিকা, রাস্তার দুইপাশে বিস্তৃত শস্যক্ষেত, খেজুর গাছ, মেহেন্দি ও ফণীমনসা। কিন্তু তার মন মানছে না, সে বাবার হাত ধরেছিল, বারে বারে তাকাচ্ছিল, বাবার দিকে। এইভাবে তার বিদ্যালয়ে যাওয়াকে শাস্তি মনে হচ্ছিল, সে তো কোনো দুষ্টুমি করেনি? বাড়ির চেনামহল থেকে দূরে সরে এসে তার কান্না পাচ্ছিল।

"আমি ইস্কুলে যাব না?" কথক তার বাবাকে সরাসরি প্রশ্নটি করে। তার বাবা বলে, "আমি মোটেই তোমাকে শাস্তির জন্য নিয়ে যাচ্ছি না, বিদ্যালয় মোটেই শাস্তির স্থান নয়। ওটা একটা কারখানা। বাচ্চা ছেলেদের প্রয়োজনী লোক হিসেবে তৈরি করা হয়।" লক্ষ করতে হবে, মাফুজ চমৎকার ব্যবহার করছেন- "The day on which I was to be cast into school for the first time" cast শব্দটি নজর করতে হবে, যেখানে শিল্প পদ্ধতিতে বিশুদ্ধ ধাতব বা গঠনের রূপায়ণ ঘটে যাচ্ছে, কথক বা ছেলেটির কথা বা ন্যারেশনের মধ্য দিয়ে কাঠামোকে ছাঁচে ফেলার প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে।

অতএব স্কুল প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে, তার কান্না পাওয়া ছাড়া কোন উপায় ছিল না। স্কুল বিল্ডিটি অনেকটা দুর্গের মতন উঁচু উঁচু দেওয়াল, কঠিন এবং হিংস্র। "I did not believe there was really any good to be had in tearing me away from the intimacy of my home and throwing me into this building that stood at the end of the road like some huge, high-walled fortress, exceedingly stern and grim." স্কুলটিকে দুর্গের মতন, চিত্রকল্পটি রচনা করে, এখানে যুদ্ধপরিস্থিতি মতন ভাবনার ইঙ্গিত দিয়ে বোঝানো হচ্ছে, ইচ্ছে করলেই উঁচু উঁচু দেওয়ালগুলিকে কেউ চাইলেই ডিঙোতে পারবে না। সেই কারণেই ছেলেটির মনে হচ্ছিল তাকে শাস্তির জন্য এখানে পাঠানো হল। যেমনভাবে কয়েদিদের কড়া প্রহরায় রাখা হয়। ছেলেটি মন্থর পায়ে স্কুল প্রাঙ্গণের দিকে এগিয়ে গেল, কেন না তার কিছুই করার ছিলনা, বাবা তাকে ধাক্কা দিয়ে গেটের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছে। স্কুলের উঠোনটি ছেলে-মেয়ে ভর্তি। পরস্পর হুটোপুটি করছে, অনেকটা আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে। উপস্থিত সবাই শারীরিকভাবে অস্বস্তি বোধ করছিল। ছেলেটি অনুভব করল, সে এই প্রাঙ্গণে একজন এমন আগন্তুক যে নিজেই পথ ভুল করে এই দুর্গের মধ্যে উপস্থিত হয়েছে। একটি ছেলে এগিয়ে এসে তার সামনে দাঁড়াল। সে তাকে এই বলে আশ্বস্ত করল, আমার বাবা আমাকে নিয়ে এসেছে। ছেলেটি উত্তরে জানাল, আমার বাবা মারা গেছে। সম্পূর্ণ গল্পটির কেন্দ্রীয়

ভাবনাটি 'মারা' গেছে শব্দটির সাথে কম্প দিল। নাগিব মাহফুজের গল্পের উৎকর্ষতার কারণ, একেবারে সঠিক শব্দ নির্বাচন করে, পাঠকের প্রথাগত পাঠ অভ্যাস ও ভাবনাকে নিমেষের মধ্যে ভেঙে দিতেন। আক্ষরিক অর্থেই ছেলেটির বাবা মৃত, অর্থাৎ কথকেরও সে একপ্রকার দশা, সেও তো এমন একটি স্থানে-বদ্ধভূমিতে উপস্থিত, বাবার সঙ্গে তার দেখা নাও হতে পারে। সে নিশ্চিত হয়ে গেছে, এই দুর্গের বাইরে সে কোনদিনই যেতে পারবে না। এর পরে যে কাণ্ডটি ঘটল, কায়রো শহরের উপনিবেশ শাসনের বাস্তব হত্ত আখ্যানভূমিতে বিস্তৃত করলেন। কয়েকটি ছেলেমেয়ে কান্নাকাটি শুরু করে দিল, পূর্বের দুর্গ ভাবনাটি প্রসারিত হল। প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল সামরিক শৃঙ্খলা। স্কুল প্রশাসকের আচরণেও তা ফুটে উঠল, ছেলেমেয়েগুলি পরিণত মানুষের মতন পদমর্যাদায় বিভক্ত হতে থাকল। ক্রমশ প্রকাশিত হচ্ছিল কড়া শাসন, নিখুঁত অনুশাসন, কঠিন প্রশাসকের চরিত্রটি দিবারাত্রির মতন সত্য হয়ে উঠল। সামরিক বাহিনীর অফিসারেরা যেমন, সামনে সৈনিকদের নিয়ে এগিয়ে যায়, সেইভাবে বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা এল এবং বাচ্চাগুলির সামনে ঘোষণা করল,- 'তোমাদের এটা নতুন বাড়ি। জ্ঞান এবং ধর্মে, আনন্দ করার এবং উপকার পাওয়ার মতো সব জিনিস এখানে আছে। এখানে তোমাদের মা ও বাবাও আছেন। চোখের জল মুছে হাসি মুখে জীবন উপভোগ কর।' উপস্থিত সবাই মাথা নত করল এবং নিবিড় আনুগত্য স্বীকার করল।

গল্পটির দ্বিতীয়ভাগে সেই খুদে ছেলেটি আর ছোটো নেই, একটি বৃদ্ধে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। স্কুলটিও ছুটি হয়ে গেছে, স্কুলের গেটের বাইরে এসে সে অবাক হয়ে দেখছে, চারপাশে কী অসম্ভব পরিবর্তন ঘটে গেছে। বাড়ি ফেরার রাস্তা পর্যন্ত চিনতে পারছে না। নাগিব এখানে ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন, ইজিপ্টের ঐতিহাসিক সুপ্রাচীন ঐতিহ্যকে, যেখানে শিল্পায়ন প্রক্রিয়াটি মোটেই মানিয়ে নিতে পারছে না। কেননা, বৈদেশিক-সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনের কায়দায় যেভাবে উৎপাত প্রক্রিয়া সচল ছিল, নাগিব কায়রোর মানুষকে সেই দুর্দশা শিকার হতে দেখছেন। বর্তমানে যে ইজিপ্ট, লুণ্ঠন ও ঔপনিবেশিক শাসনে জর্জরিত যে ইজিপ্ট, সেই ইজিপ্টের বর্তমান সাংবিধানিক নাম হল, ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক অফ ইজিপ্ট, খ্রিঃ পূর্ব ৩৫০০ থেকে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ধারা প্রবাহিত। মেসোপোটামিয়ান, রোমান, গ্রীক সংস্কৃতি- বিভিন্ন জীবনধারা যা ফ্যারাওদের রাজত্বকালে গড়ে উঠেছিল, সেই অস্থিতিশীল পরিবর্তিত ধারা বৃদ্ধকে ক্লান্ত করল, বৃদ্ধ বিরক্ত হল যখন সে স্কুল গেটের বাইরে এসে দেখল তার নিজের দেশ ইজিপ্ট কীভাবে বিধ্বস্ত। দ্রুত যন্ত্রের শাব্দিক প্রক্রিয়া যা পরিবেশে কর্মিডোরের মতন যন্ত্রণাদায়ক খোঁচা দিচ্ছিল, ক্রমশ প্রসারিত কায়রো, যে শহরে নাগিবের বেড়ে ওঠা সেই শহরে ক্রমশ শিল্পায়নের বৃদ্ধি, প্রাচীন সময়ের সাথে আধুনিক সময়ের সংঘাত নাগিব এই পরিবর্তনকে খোলামনে মেনে নিতে পারেননি। কথকের মনে, বৃদ্ধ মানুষটির, কাহিনীটির ন্যারেটরের উক্তিটি লক্ষণীয়;

"হে ভগবান! দুপাশে বাগান দেওয়া রাস্তাটা কোথায়? সেটা কোথায় উধাও হয়ে গেছে? এইসব যানবাহন কবে এখানে আক্রমণ করল? আর কবে এই পাল পাল মানুষ এর ওপর এসে বিশ্রাম নিতে শুরু করল? কেমন করেই বা এই জঞ্জালের ঢিপি গুলো দু-দিকে ঢেকে ফেললো? আর যে শস্যক্ষেতগুলো দুধারে ছিল গেল কোথায়? উঁচু উঁচু বাড়ি হয়েছে, রাস্তাটা বাচ্চায় ভর্তি আর বিরক্তিকর আওয়াজ বাতাস কাঁপাচ্ছে।... "আমার বাড়ি যেতে হলে আবু খোদা পেরোতে হয় কিন্তু গাড়ির গতি আমাকে পেরোতে দেবে না। দমকলের গাড়িটার ঘন্টা উঁ চু করে চিৎকার করে চলেছে যেটা আবার চলেছে শামুকের গতিতে। আর আমি নিজেকে বললাম, 'আগুনটা যা খাচ্ছে তাতে সেই আনন্দ পাক।' খুব বিরক্ত হয়ে ভাবতে লাগলাম কখন পেরোতে পারব। আমি অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলাম যতক্ষণ না কোনার দোকানে যে অল্পবয়সি ছেলেটা ইস্তিরি করে সে আমার কাছে এল। হাত বাড়িয়ে সৌজন্য-পরায়ণভাবে বলল, 'দাদু চলুন আমি আপনাকে ওপারে নিয়ে যাচ্ছি।'" (অনুবাদ : জয়িতা বাগচী)

জীবনচক্রের মাঝে প্রবাহিত সময় বড়োই বিস্ময়কর। 'Half a Day' বা 'অর্ধেকদিন' নাগিব মাহফুজের সেরা গল্পগুলির অন্যতম। দুঁদে পণ্ডিতরা মনে করছেন, বর্তমান দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম গল্প এটি, কেন-না অসংখ্য সমালোচক ও আলোচক, ইতিহাসবিদ, সমাজবিজ্ঞানী, দার্শনিক 'অর্ধেকদিন' গল্পটির প্রতি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বহুমাত্রিক আলো ফেলেছেন।

সুদীপ চক্রবর্তী

জয়দীপ নিয়োগী

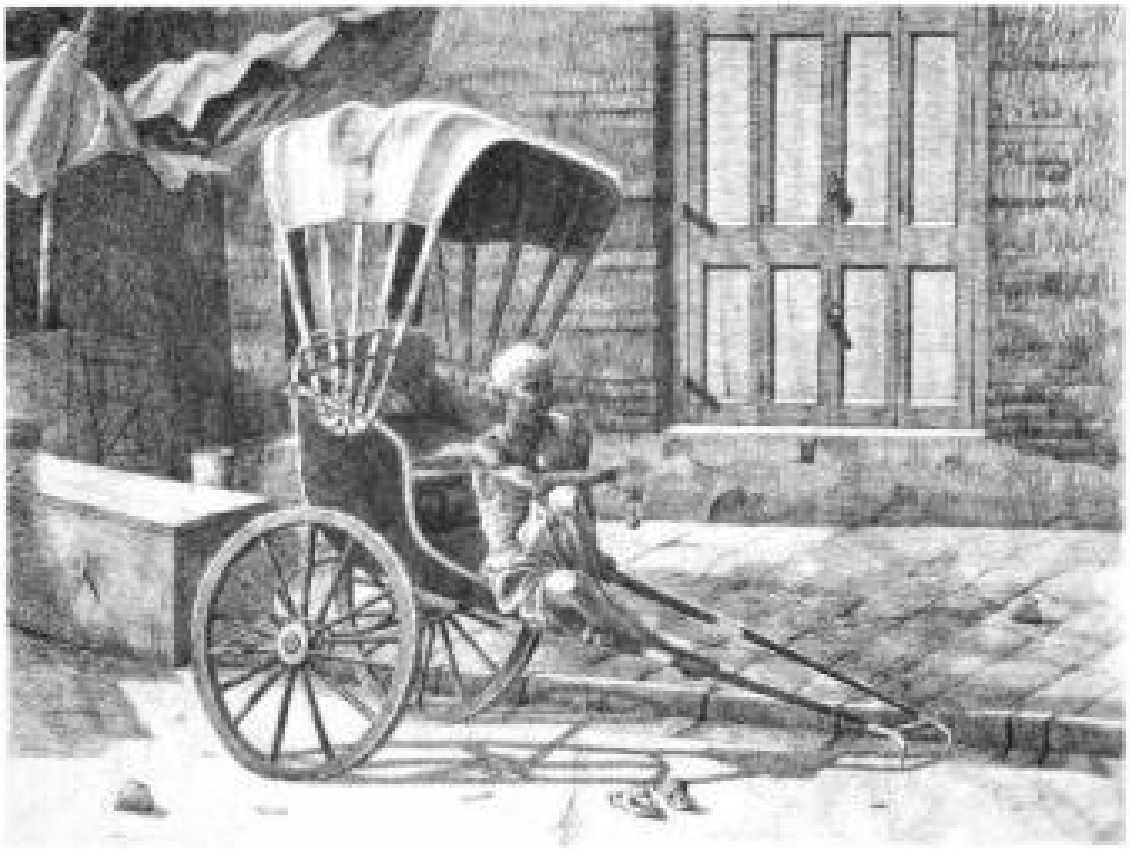

সৌমেন ভট্টাচার্য - কালযাপন

কলকাতা নিয়ে লেখা শুরু করার আগে অনেক ভেবে, এদিক ওদিক হাতড়েও মন মতো কিছুই জোগাড় হল না। তাই ভাবলাম দেখি আজ আমার বন্ধুরা কি ভাবছে শহর নিয়ে... ওরা কি ভাবে দেখছে কলকাতাকে।

আজ আমার বন্ধুরা তাদের শহরকে কি ভাবে দেখে? কেউ বলছে কলকাতা হলো ব্যস্ত শহর, একটু সময় নষ্ট করার সময় নেই তার কাছে। আবার কেউ ভুলতে পারছে না শহরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ফুচকা আর তেলপুরির স্বাদ। কারো কাছে উত্তপ্ত মরুভূমি, যে কোন সময় ঝলসে দিয়ে যেতে পারে তোমার চোখ। আবার কখনও কলকাতা একটি শিশু, যে এখনও চলেছে হামাগুড়ি দিয়ে, হাত ধরে একটু তুলে ধরলেও দু-পায়ের বেশি সে এগোতে পারে না। কেউ বলেছে কলকাতা মানেই উত্তর কলকাতা - শ্যামবাজার, বাগবাজার, মানিকতলা, আমহার্স্ট স্ট্রীট। অলিতে গলিতে লুকোচুরি খেলা, পাড়া ক্রিকেট, ফুটবল, আর গলির শেষে ক্যারাম।

আজ আমার কলকাতা সেই সমস্ত মানুষ দের কে উৎসর্গ যাদের প্রতিদিনের জীবন যাপন আমাদের কাছে অধরা। যারা না থাকলে আজ কলকাতা, কলকাতা হয়ে উঠত না। আজ প্রায় হারিয়ে যাওয়া টানা রিক্সার চলার ঝুন্ ঝুন্ শব্দ আমরা শুনতে পাইনা শহরের রাস্তায়। কিন্তু একটু কান পেতে শুনতে চেষ্টা করলে হয়ত শুনতে পাবো সেই ঝুন্ ঝুন্ শব্দ অথবা কেউ বলে উঠবে "কাহা জানা হে বাবু" ।।

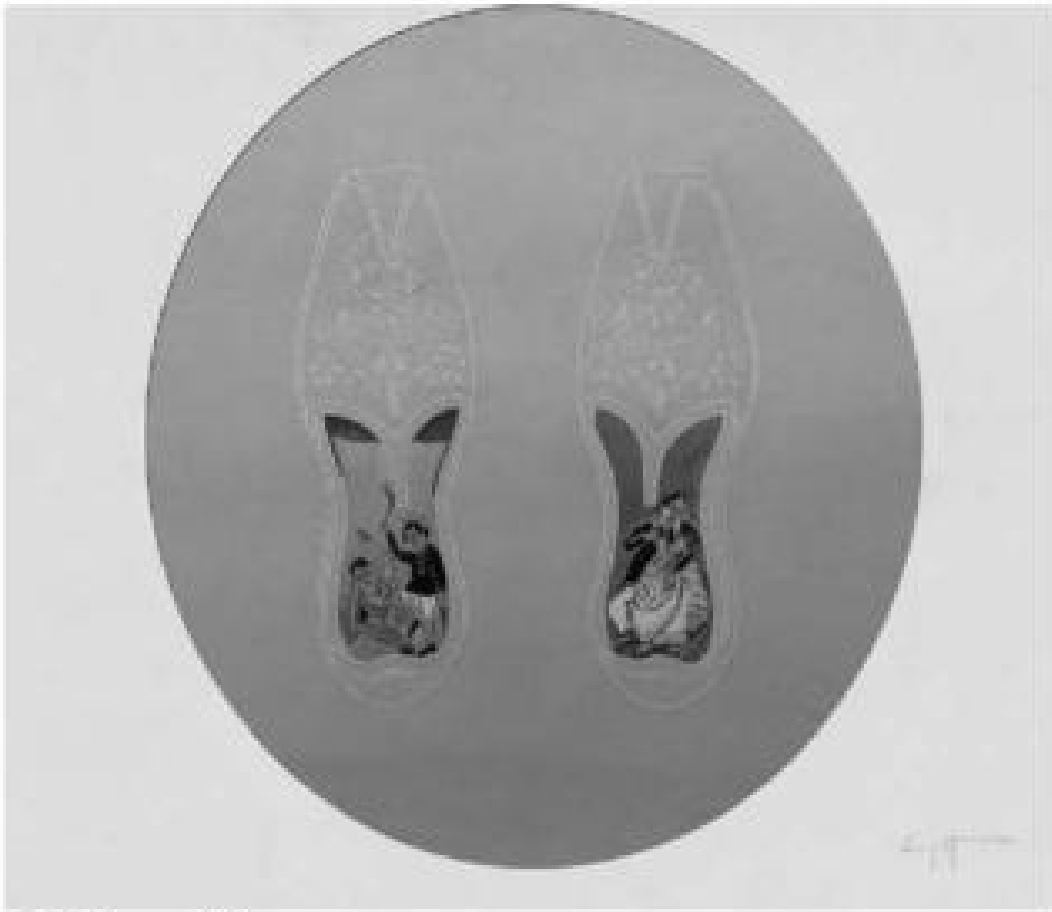

TITLE : PAIR
MEDIUM : ACRYLIC
SIZE : 32 INCH X 28 INCH
YEAR : 2015

অভিজিৎ শীল - যুগল

" বাবু" ভারতীয় কালীঘাট পটচিত্রে বহুল ব্যবহৃত এক চরিত্র। আমরা ভারতীয় ও বিদেশী শিল্পকর্মে বিভিন্ন বাবু চরিত্রের নিদর্শন পাই।

ন্যাপড়া জুতো তুলে ধরছে মানুষের চরিত্রের বিভিন্ন দিক। যার সাথে আমরা মিল পাই বর্তমান সমাজের। এই ছবিটিতে সেটাই তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

অগ্নিমিত্র দাস - অযান্ত্রিক

আমার কলকাতায় আসা আর্ট কলেজে পড়াশুনার সূত্রে। শহরের পথে ঘুরে ঘুরে ছবি আঁকতে গিয়ে প্রথম নজরে পড়ল কলকাতার ট্রাম, যা আমাদের এই শহরের বহু রাস্তায় চলে বেড়াচ্ছে বহুদিন ধরে।

ব্যস্ত কলকাতায় বসে ছবি আঁকার জায়গার অভাব খুব, তার মধ্যেই একটু জায়গা করে বসে পড়লাম ধর্মতলা বাস টার্মিনাসে। অদ্ভুত ভাবেই নজর গেল পরিত্যক্ত একটি ট্রাম ইঞ্জিনের দিকে। আর সেটাই হল আমার আঁকার বিষয়।

কিন্তু যতো দিন যাচ্ছে কমে যাচ্ছে ট্রামের চলা চল, কমে যাচ্ছে মানুষের ট্রামে ওঠার সংখ্যাও। মানুষের ব্যস্ততা যে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে ধীর গতির এই যান। আমাদের প্রিয় শহর, প্রিয় কলকাতার এই ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখা আমাদের কর্তব্য, অন্তত একজন শিল্পী হিসেবে এটাই আমার দায়িত্ব।

স্মার্থ সাহা - অলসযাত্রা